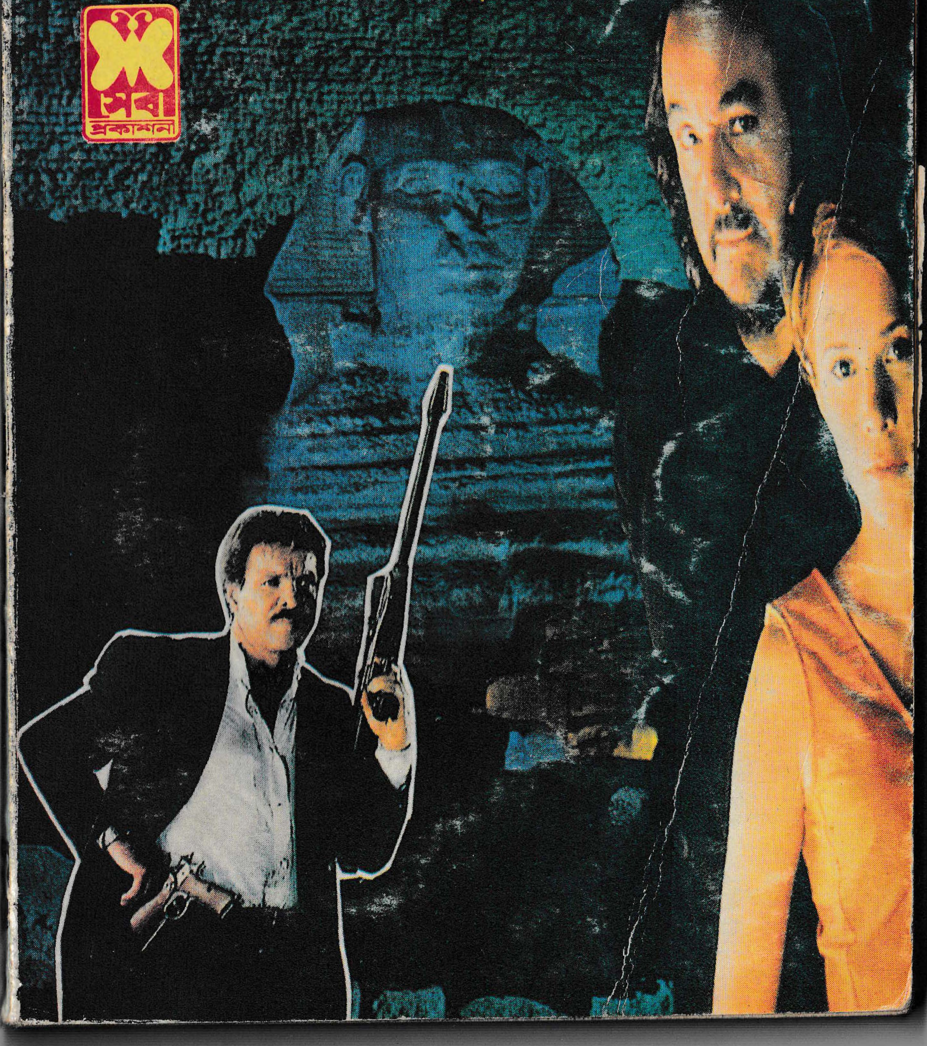
মাসুদ রানা

বিষাক্ত থাবা

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা ৩০০

বিষাক্ত থাবা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

এক

আগুনে-কমলা রঙা সিঁদুরে মেঘের অদ্ভুত আভায় হাসছে ঘোলা টেমস। রাজ্যের জঞ্জাল আর ফেনা বুকে নিয়ে কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ শব্দে ছুটে চলেছে মোহনার দিকে। হারবারে গিজগিজ করছে অসংখ্য ছোট-বড় নৌ যান, অন্যদের সতর্ক করতে থেকে থেকে ভেঁপু বাজাচ্ছে। দু'তীরের দালানকোঠায় বাড়ি খেয়ে চড়া, ভরাট প্রতিধ্বনি তুলছে সে আওয়াজ। চমকে উঠে দিক বদল করছে উড়ন্ত সী গাল, সামলে নিয়ে প্রপেলারের আঘাতে আলোড়িত পানিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাচ্ছে। সুযোগ বুঝে ঝাঁপ দিচ্ছে, পরক্ষণে উঠে পড়ছে মাছ নিয়ে। আগুনে রূপালী মাছ ছটফট করছে ওদের ঠোঁটে।

আকাশে রঙের উজ্জ্বলতা ক্রমে বাড়ছে। কমলা বিদেয় নিয়েছে, এখন আছে কেবল আগুন রং। তার আভায় মনে হচ্ছে চারদিকের সবকিছুতে আগুন ধরে গেছে বুঝি।

রানা এজেন্সি। লন্ডন।

অফিস রুমের জানালার ভারী কার্টেন সরিয়ে পোর্টের দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। কারও অপেক্ষায় আছে। চিন্তায় ডুবে আছে। প্রায় চার মাস হতে চলেছে দেশছাড়া ও। জটিল এক অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ইওরোপের কয়েকটা দেশে ছুটে বেড়াতে হয়েছে এতদিন। কাজ শেষ হতে ক'দিন আগে এখানে এসেছিল

দেশে ফেরার আগে জমে ওঠা জরুরী কিছু ফাইল ওয়র্ক সেরে যাবে বলে। কিন্তু প্রথমটা হলেও পরেরটা আপাতত হচ্ছে না।

কাজ নামের সিন্দবাদের আরেক ভূত এখানে ওর অপেক্ষায় ছিল, পৌঁছতেই ঘাড়ে চেপে বসেছে। আটকে দিয়েছে। দেশে নয়, মিশর যেতে হচ্ছে এখন। আড়াই হাজার বছর আগে লিবিয়ান ডেজার্টে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া বিশাল এক ধন-রত্নের ভাণ্ডারের খোঁজে।

এ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই দেখে প্রথমে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এখন অবশ্য মানিয়ে নিয়েছে। বরং অভিযান সফল হলে দেশ কিছু নগদ পাবে, এই আশায় বুক বেঁধেছে রানা।

ব্যাপারটার সূত্রপাত রেকর্ড হয়ে থাকা এক টেলিফোন মেসেজের মাধ্যমে। ও যখন ইওরোপে চক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছে, তখন খুব ঘনিষ্ঠ এক ইংরেজ বান্ধবীর ফোন আসে ওর এখানকার ব্যক্তিগত নাম্বারে। প্রথমে ঢাকায় ফোন করে মেয়েটি, ওখান থেকে এখানে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তাকে। ফোনে বান্ধবী জানিয়ে রেখেছে, ওকে তার খুব প্রয়োজন। সে নিজে যদিও লন্ডন থাকতে পারছে না, কিন্তু তার বাবা থাকছেন। রানা লন্ডন পৌঁছলেই দয়া করে তাঁকে যেন একটা ফোন করে। তিনি এসে জানাবেন প্রয়োজনটা কি।

তখনই রানা বুঝেছে নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে ও, কিন্তু কিছু করার ছিল না। ইদানীং কিছুদিন দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ না থাকলেও মেয়েটির সঙ্গে ওর সম্পর্ক যথেষ্ট আন্তরিক। তার অনুরোধ উপেক্ষা করার উপায় ছিল না।

ওর নাম সিলভি। বাবা বিখ্যাত ইজিপ্টোলজিস্ট, স্যার কার্টার। রানার পরিচিত। এক সময় অক্সফোর্ডের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন। রানা জানত বর্তমানে মিশরে আছেন তিনি, খোঁড়াখুঁড়ির

কাজে ব্যস্ত। গত কয়েক বছর ধরে এই নিয়েই আছেন। মাসকয়েক আগে একমাত্র সন্তান সিলভিও গিয়ে জুটেছে সাথে। আড়াই হাজার বছর আগে পারস্য সম্রাট ক্যামবিসিসের হারিয়ে যাওয়া ধন-রত্ন খুঁজে বের করার কাজে তাঁকে সাহায্য করতে। বাবার লাইনেই পড়াশুনা ওর, এর আগেও বহুবার মিশরে গেছে। ও দেশের প্রাচীন ইতিহাসের আরেক বিশেষজ্ঞ বলা চলে তাকে।

ওর ফোন পেয়ে সেদিনই ছুটে এসেছেন বৃদ্ধ ইজিপ্টোলজিস্ট। প্রাচীন এক ইতিহাস খুলে বলেছেন ওকে। সেটা এরকম: পাঁচ হাজার বছর, কি তারও আগে থেকে পৃথিবীতে মিশর ছিল সবচেয়ে ধনী দেশ। সবদিক থেকে সমৃদ্ধ দেশ। জ্ঞানে সংস্কৃতিতে এত উন্নত ছিল যা অকল্পনীয়। তখনকার দিনে মেমফিস ও থিবস ছিল দেশের সবচেয়ে বড় ও সম্পদশালী শহর। এরমধ্যে থিবসের গুরুত্ব ছিল বেশি, কারণ আঠারো, উনিশ ও বিশতম ফারাও সম্রাটের রাজধানী ছিল ওটা। তাই ওখানকার সোনা ও মণি-রত্নের মজুতও ছিল বিশাল।

ওদিকে পারস্য সাম্রাজ্যও তখন বিস্তৃত হচ্ছে, ওদেশের সম্রাট ক্যামবিসিসের সামরিক শক্তি দিন দিন বাড়ছে। মিশরের উন্নতি সহ্য হচ্ছিল না তাঁর, তাই খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে মিশর আক্রমণ করেন তিনি, ফারাও সম্রাট পমেটিচাস থার্ডকে পরাজিত করে নিজেকে থিবসের সম্রাট ঘোষণা করেন। এরপর নজর দেন সাম্রাজ্য আরও বাড়ানোর দিকে। নাইল ভ্যালির পশ্চিমে লিবিয়ান মরুভূমি–উত্তর, দক্ষিণে এক হাজার মাইল দীর্ঘ, চওড়ায় নয়শো মাইল। সাহারার ওই অঞ্চল সম্পূর্ণ পানিশূন্য। তাই কোনও আরব কখনও ওই মরুভূমি পাড়ি দিতে সাহস করেনি। এই সেদিন, ১৯২০ সালে প্লেনে করে আমেরিকানরা প্রথম পাড়ি দিয়েছে ওটা।

ক্যামবিসিস খবর পেলেন মরুভূমির ওপারে, উত্তর-পশ্চিমে

থিবসের চাইতেও অনেক বেশি সম্পদশালী আরেক শহর আছে, নাম ওয়েসিস অভ সিওয়া। অতীতে নাম ছিল ওয়েসিস অভ জুপিটার আম্মন। দুর্ধর্ষ সেনাসি আরবরা থাকে ওখানে। লোভে পড়ে ওই শহরও দখল করার বুদ্ধি আঁটলেন ক্যামবিসিস।

সমরশক্তি কোন সমস্যা নয়, সমস্যা অন্যখানে। ওখানে পৌঁছতে কোনাকুনি এগোলেও অন্তত তিনশো মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে তাঁর বাহিনীকে। পানি ছাড়া কি করে তা সম্ভব? এ নিয়ে কয়েক মাস মাথা ঘামালেন ধূর্ত ক্যামবিসিস, এবং চমৎকার এক উপায়ও বের করে ফেললেন। সেই সাথে নতুন এক সিদ্ধান্তও নিলেন, দখল শেষে ওয়েসিস অভ সিওয়াতেই গড়ে তুলবেন নিজের নতুন রাজধানী।

যা হোক, পানি সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রথমে ত্রিশ হাজার ওয়াইন জার জোগাড় করলেন ক্যামবিসিস, সবগুলো পানি ভর্তি করিয়ে বিশাল ক্যারাভ্যানে করে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন। সারাদিন চলার পর ক্যারাভ্যান যাত্রা যেখানে শেষ হলো, সেখানে বালি খুঁড়ে সব জার পুঁতে রাখা হলো যাতে পানি বাষ্প হয়ে উবে যেতে না পারে।

আবার ত্রিশ হাজার জার জোগাড় করে একইভাবে পাঠিয়ে দেয়া হলো দু'দিনের যাত্রায়, পরের বার তিনদিনের। এই চলল কয়েক মাস। অবশেষে ক্যামবিসিসের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর অনায়াসে মরুভূমি পাড়ি দেয়ার মত পানির ব্যবস্থা হলো। এরমধ্যে পারস্য থেকে নিজের যাবতীয় সোনাদানা ইত্যাদি আনিয়ে নিয়েছেন ক্যামবিসিস, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে থিবসের ধন-সম্পদ। সব মিলিয়ে পরিমাণটা হলো বিশাল।

ঘুষ দিয়ে কিছু সেনাসি আরবকে দলে নিয়ে এলেন ক্যামবিসিস, তাঁর বাহিনীর পথ প্রদর্শকের কাজ করবে ওরা।

এরপর শুরু হলো তাঁর যুদ্ধযাত্রা। কিন্তু সেনাসিরা আসলে ভেতরে ভেতরে বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় করছিল, দুই-তৃতীয়াংশ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ক্যামবিসিসকে বিপথে ঠেলে দিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল লোকগুলো।

জনমের মত ফেঁসে গেলেন ক্যামবিসিস। গাইড ছাড়া কয়েকদিন মার্চ, কাউন্টার-মার্চ করতে করতে দিশেহারা হয়ে পড়ল সৈন্যরা, উপায় নেই দেখে হতাশ হয়ে থিবসে ফিরে যেতে চাইলেন সম্রাট। সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে ক্যামবিসিস, তাঁর কয়েকশো অফিসার ও পঞ্চাশ হাজার সৈনিকের একজনও আর ফিরে আসতে পারেনি, বহু মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের রত্ন-অলঙ্কারসহ চিরতরে হারিয়ে গেছে মরুভূমিতে। কিন্তু এত শতাব্দী পর্যন্ত হেরোডোটাসের সে ইতিহাস কেউ বিশ্বাস তো করেইনি, বরং তাঁকে মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ ইত্যাদি বলে গালাগাল দিয়ে এসেছে।

অথচ ঘটনা বর্ণে বর্ণে সত্যি। আরও সত্যি যে এই সত্যতার আবিষ্কারক স্বয়ং স্যার কার্টার। হেরোডোটাসের লেখা ইতিহাস অনুযায়ী ক্যামবিসিস যে এলাকায় পথ হারিয়েছেন, গত কয়েক বছর ধরে সেই অঞ্চল চষে বেড়িয়েছেন তিনি। অবশেষে জায়গাটার হদিস পেয়েছেন।

তাঁর কাহিনী নীরবে শুনছিল রানা, কিন্তু এই পর্যায়ে আর মুখ না খুলে পারল না। 'কি করে?' বলল ও।

হাসলেন মানুষটা। ষাটের মত বয়স, মাঝারি উচ্চতা। শক্তপোক্ত গড়ন। মাথাজোড়া টাক। মুখ খোলার আগে মসৃণ মাথায় হাত বোলালেন তিনি দু'বার। 'ওয়েল, লাকসরের আড়াইশো মাইল পশ্চিমে ওয়েসিস অভ দাখলা নামে এক জায়গা

আছে, ওটা ছিল ক্যামবিসিসের সিওয়া যাত্রাপথের বিশ্রামের জায়গাগুলোর একটা। গত বছর ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে একটা কবর ফলক পেয়েছি আমি। ওটা ক্যামবিসিসের এক সেনাপতির, তার নাম হেরু-টেম।'

'ক্যামবিসিসের সেনাপতির কবর ফলক?' বিস্মিত হয়ে ঝুঁকে বসল রানা। 'ওই জিনিস এল কোত্থেকে! একটু আগে না বললেন ওদের কেউই ফিরে আসতে পারেনি?'

'হ্যাঁ, বলেছি,' মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'তবে ওটা ছিল হেরোডোটাসের কথা, আমার নয়।'

'আচ্ছা! বলে যান, প্লীজ!'

'ক্যামবিসিসের বাহিনীর মধ্যে একমাত্র এই মানুষটিই বেঁচে গিয়েছিল কি করে যেন। জীবন নিয়ে কোনমতে ওয়েসিস অভ দাখলায় পৌঁছতে পেরেছিল। এর ব্যাপারে ইতিহাসে কিছু নেই। কেন না এ ঘটনা হেরু-টেম কাউকে জানায়নি। ওখানে সে ছিল বিদেশী, শত্রু। আসল পরিচয় ফাঁস হলে স্থানীয়রা তাকে মেরে ফেলবে, এই ভয়ে মুখ খোলেনি সে। শুধু তাই নয়, বাকি জীবন বোবার অভিনয় করে গেছে হেরু-টেম। দাখলাতেই খেজুর চাষীর ছদ্মবেশে থেকে গেছে। অবশ্য বেশিদিন বাঁচেনি লোকটা।'

'এতকিছু আপনি জানলেন কি করে?' বিস্ময় আরও বাড়ল ওর।

'হেরু-টেমের কবর ফলক পড়ে। ওটায় হায়রোগ্লিফিকের সাহায্যে সেই করুণ ঘটনার পুরোটাই লিখে রেখে গেছে সে। কেবল ঘটনাই নয়, যেখানে সৈন্যরা সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়ে, গিজার পিরামিডের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট নক্ষত্রের সাহায্যে সেই জায়গাও চিহ্নিত করেছে লোকটা। ফলকে আছে সে নির্দেশনা, আমি পড়েছি।'

চুপ করে থাকল রানা, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সবকিছু আষাঢ়ে মনে হচ্ছে ওর, বিশ্বাস করতে বাধছে। ওর মনের অবস্থা বুঝে নিতে দেরি হলো না অভিজ্ঞ মিশর-বিশেষজ্ঞের। হাসলেন তিনি। 'আমি জানি তুমি কি ভাবছ, ইয়াং ম্যান। কিন্তু ভুল লাইনে ভাবছ। এসব মিথ্যে হওয়ার কোন চান্স নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মুখ খুললেন। 'আমি তোমার অচেনা নই, তাছাড়া আমার পেশাগত পরিচয়ও তো তুমি জানো। গত চার-পাঁচ বছর ধরে এই সত্য উদ্ঘাটনের জন্যেই লেগে ছিলাম আমি। কাজেই মনে কোনও রকম সন্দেহ জেগে থাকলে দূর করে দাও।'

'না, ঠিক···তা নয়···' আমতা আমতা করে বলল ও। 'আমি···'

এক হাত তুলে থামিয়ে দিলেন প্রফেসর। 'ফলকটা উদ্ধার করার পর ওটা কেড়ে নেয়ার জন্যে আমার ওপর দু'বার হামলা হয়েছে, দু'বারই খুব অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছি আমি।'

চোখ কুঁচকে উঠল রানার। 'কারা···?'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'জানি না। তবে অনুমান করতে পারি।'

'কিরকম?'

'নিজের টাকা-পয়সা যা ছিল, গত কয়েক বছর ও দেশে একনাগাড়ে কাজ করতে গিয়ে তার প্রায় সবই শেষ হয়ে গেছে। শেষের দিকে কর্মচারীদের সময়মত বেতন দিতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এই নিয়ে আমার একান্ত সহকারী; আমারই ছাত্র, কিছুদিন আগে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। ও যাওয়ার পরদিনই হয় প্রথম হামলা। দু'দিন পর আবার।

'তাই বুদ্ধি করে ফলকটা ভেঙে দু'ভাগ করেছি আমরা। একভাগ নিয়ে লন্ডন চলে এসেছি আমি। বলতে পারো পালিয়েই

এসেছি। না এলে হয়তো অন্যকিছু ঘটে যেত। হয়তো হাতছাড়া হয়ে যেত জিনিসটা। তাই কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে চলে এসেছি আমি। অন্যটা মিশরে সিলভির জিম্মায় আছে, ব্যাঙ্কের ভল্টে। আমার অংশও এখানকার ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখেছি।'

'বুঝলাম। কিন্তু হামলা যে ওটার জন্যেই হয়েছে, তার নিশ্চয়তা কি?' প্রশ্ন তুলল রানা।

'ওটার জন্যেই হয়েছে,' দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন কার্টার। 'আমি জানি। আমার সহকারী আমারই ছাত্র, ক্যামবিসিস সম্পর্কে প্রায় সবই জানে। আমরা ফলকটা পাওয়ার পর হঠাৎ করেই উগ্র হয়ে ওঠে ছেলেটা। আমি শিওর, সরে পড়ার জন্যে ও গায়ে পড়েই ঝগড়া বাধিয়েছে আমার সাথে। বেতন ক'দিন পরে নিলে কিচ্ছু আসত-যেত না। আমাদের সঙ্গে থাকছে, খাচ্ছে। আমারই পয়সায় সব চলছে ওর। তাছাড়া তেমন আপনও কেউ নেই যে ওর টাকার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে। কাজেই অন্তত এই কারণে ওর অমন আচরণের কোন যুক্তিই নেই।'

বেশ কিছু সময় পর মুখ খুলল ও। 'এখন তাহলে কি করতে চাইছেন আপনি?'

'পরিস্থিতির কারণে আত্মগোপন করে আসতে বাধ্য হয়েছি ঠিকই, কিন্তু ফলকটা পেয়েই প্ল্যান করেছিলাম আমি লন্ডন আসব অভিযান পরিচালনার জন্যে একজন অর্থ জোগানদার খুঁজে বের করতে। নিজের তো সব শেষ,' বলে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

'তো? হলো টাকার ব্যবস্থা?'

'হ্যাঁ। সিলভির এক বান্ধবী রাজি হয়েছে টাকা দিতে। সে-ও আমারই ছাত্রী, নাম ক্লারিসা। ক্লারিসা বেলভিল। খুব বড়লোকের মেয়ে। টাকা তো দিচ্ছেই, তারওপর স্বামী সহ নিজেও অভিযানে অংশ নিতে চাইছে।'

'তাহলে তো ভালই।' ওর পরের প্রশ্নের জবাব কি হবে আগেই অনুমান করে নিয়েছে রানা, তবু বলল, 'এ ব্যাপারে আমি কি সাহায্য করতে পারি আপনাদের?'

মনে মনে বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন প্রফেসর। 'দেখো, রানা, আমার সন্দেহ হচ্ছে ফিলিপ বয়েল, মানে আমার সেই সহকারীর কথা বলছি, সে খুব সম্ভব ও দেশের কোন অপরাধী গ্রুপের সাথে হাত মিলিয়েছে আমার এত পরিশ্রমের ফসল কেড়ে নিতে। "খুব সম্ভব" আসলে কথার কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই করেছে ও। ছেলেটা ক্যামবিসিসের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস জানে, হায়রোগ্লিফিক ভাষার মর্মোদ্ধারও করতে জানে। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চই?'

ওকে মাথা দোলাতে দেখে নার্ভাস হাসি হাসলেন কার্টার। 'ও যদি ফলক কেড়ে নেয়, ঠেকাতে পারব না আমি। সে ক্ষমতা আমার নেই। তোমার আছে। তাছাড়া এ ধরনের অভিযানের অভিজ্ঞতাও আছে তোমার।'

ইচ্ছে করেই থামলেন বৃদ্ধ। ঠোঁট চাটলেন। 'তার ওপর মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তুমি বললে খোঁড়াখুঁড়ির অনুমতি পেতে কোন সমস্যা হবে না। এসব বিবেচনা করে আমরা ঠিক করে রেখেছি তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকার অনুরোধ করব। অবশ্য, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

আবার ঠোঁট চাটলেন তিনি, হাত বোলালেন টাকে। 'নইলে হয়তো...'

তাঁকে উসখুস করতে দেখে ও বলল, 'কি?'

'নইলে বাধ্য হয়ে আইডিয়াটা আর কোন আগ্রহী পার্টির কাছে বিক্রি করে দিতে হবে। আর তুমি যদি রাজি হও, খুঁজে পেতে যদি ওগুলো পেয়ে যাই আমরা, নিয়ম অনুযায়ী উদ্ধার করা মালের

দামের শতকরা বিশ ভাগ দেবে আমাদের মিশর সরকার। বহু মিলিয়ন পাউন্ড দামের ধন-রত্ন, রানা। যেমন-তেমন ব্যাপার নয়। টাকা যা আসবে, সমান তিন ভাগে ভাগ করে নেব আমরা। আমার জীবন ধারণের জন্যে টাকার প্রয়োজন। তোমার সে সমস্যা নেই। তোমার ভাগের টাকা তুমি দেশের কাজে খরচ করতে পারবে।'

প্রফেসর রানার দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন, তাই জায়গামতই খোঁচাটা লাগালেন, তারপর অপেক্ষায় থাকলেন ওর প্রতিক্রিয়া দেখার।

'আপনার প্রস্তুতি কতদূর?'

চেহারায় চাপা উল্লাস ফুটল বৃদ্ধের। 'এই তো, মিশরে পৌঁছে কিছু কেনাকাটা সেরেই রওনা দেব। দু'চারদিনের ব্যাপার। ওহ্, আর জাহাজে করে যেতে কয়েকদিন লাগবে, ব্যস্।'

'জাহাজে কেন?'

'সিলভির যে বান্ধবীর কথা বললাম, ওর নিজের বড় এক লাগজুরিয়াস প্যাসেঞ্জার লাইনার আছে। লন্ডন-আলেকজান্দ্রিয়া রুটে চলে। ও বলছিল ওটায় করে যেতে। পরশু ছাড়বে ওটা।'

'সিলভির একা মিশরে থেকে যাওয়ার কারণ কি? আপনার সাথে এল না কেন?'

'এমনিই,' শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ। 'ওখানকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার জন্যে ইচ্ছে করেই থেকে গেল ও। ফিলিপের ওপর আর কি!'

'লোকটা ওখানেই আছে?'

'ছিল। গত কয়েকদিন থেকে দেখা নেই, ডুব মেরেছে শুনেছি।'

প্রকৃতির রং খুব দ্রুত মরে যাচ্ছে, আঁধার হয়ে এসেছে আকাশ। বন্দরের হাজারো আলোয় অন্যরকম চেহারা হয়েছে

তার। কার্টেন ছেড়ে পিছিয়ে এল রানা, বসে পড়ল ডেস্কে। ওর সামনেই ছড়িয়ে আছে কয়েকটা ছবি, হেরু-টেমের কবর ফলকের। প্রত্যেকটায় হায়রোগ্লিফিকের হিজিবিজি আঁকিবুকি রয়েছে। মহাদুর্বোধ্য। ওসবের কিছুই বোঝে না রানা।

আনমনে ওগুলোয় চোখ বোলাতে লাগল। স্যার কার্টারের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে ও। না হওয়ার কোন কারণ নেই, বড় অঙ্কের টাকা কামানোর এমন এক নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া করা বোকামি হত। তাছাড়া প্রফেসরকে সাহায্য করার মত মানবিক বিষয়টাও জড়িত এর সাথে। ক্যামবিসিসের ধন-রত্নের খোঁজ বের করতে গিয়ে নিজের যা ছিল, সবই খরচ করে ফেলেছেন ভদ্রলোক, এটাই এখন তাঁর একমাত্র ভরসা।

প্রাচীন আমলের এ ধরনের নিরুদ্দেশ ধন-রত্ন কেউ খুঁজে বের করতে পারলে তাকে আইন অনুযায়ী মালের চলতি বাজার দর হিসেবে বিশ পার সেন্ট দেয় মিশর সরকার। যদি অভিযান সফল হয়, পরিশ্রম সার্থক হবে ড. কার্টারের। রানাও দেশকে সামান্য হলেও সাহায্য করতে পারবে।

প্রফেসরের সঙ্গে আলোচনা সেরে বিষয়টা রাহাত খানকে জানাতে ঢাকায় যোগাযোগ করেছিল রানা। বিন্দুমাত্র আপত্তি করেননি বৃদ্ধ। অবশ্য মিশর যাত্রা করার আগে সদ্য শেষ হওয়া অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে রিপোর্ট করতে বলেছিলেন ওকে। সে কাজ শেষ। বিস্তারিত রিপোর্ট রেডি, আগামীকাল ঢাকার উদ্দেশে উড়াল দেবে ওটা।

ক্লারিসার জাহাজ এস.এস. হ্যাম্পশায়ারও কাল বিকেলে আলেকজান্ড্রিয়া যাত্রা করবে।

ইন্টারকমের রিং শুনে ঝুঁকে বসে সুইচ টিপল ও। 'ইয়েস?'

'ডক্টর কার্টার এসেছেন, মাসুদ ভাই,' বলল এক মেয়েকণ্ঠ।

'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বেলভিলও আছেন সাথে।'

'ওঁদের নিয়ে এসো, প্লীজ।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন কার্টার, তাঁর পিছনে একজোড়া যুবক-যুবতী। ক্লারিসা ও হ্যারি বেলভিল। রানার প্রায় সমবয়সীই হবে হ্যারি। লম্বায় একটু খাটো। স্লিম। চমৎকার পুরুষালী চেহারা। চোখ জোড়া যেন সারাক্ষণ হাসে। ক্লারিসা ছোটখাট মেয়ে, নজর কাড়া চেহারা। হাসিটা ভারি মিষ্টি। কথা বলে ধীরে, গুছিয়ে।

পরিচয় পর্ব সেরে কাজের কথায় মন দিল ওরা।

দুই

পরদিন শেষ দুপুরে যাত্রা শুরু করল এস.এস. হ্যাম্পশায়ার। হালকা কুয়াশার চাদর ঝুলছে তখন চারদিকে, সূর্যের আলো আছে, তবে তেজ নেই। ভেজা ভেজা মৃদু বাতাসও আছে। পরিবেশ খোলা ডেকে থাকার মত নয়, তাই অন্যদের মত রানাও নিজেকে বন্দী করে রাখল কেবিনে।

ওর পাশের কেবিনে রয়েছে বেলভিল দম্পতি। চমৎকার হাসিখুশি, প্রাণখোলা মানুষ দু'জনেই। প্রফেসর কার্টারের মুখে শুনেছে, মিলিওনিয়ার জাহাজ ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র মেয়ে ক্লারিসা। লেখাপড়া করেছে অক্সফোর্ডে, ড. কার্টারেরই ছাত্রী সে। সিলভির সাথে বন্ধুত্ব ওখানেই।

কিছুদিন আগে বাবা মারা যাওয়ায় এখন বিশাল সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক। মাস দুয়েক আগে নিজের পছন্দের পাত্র হ্যারিকে বিয়ে করেছে। সে-ও জাহাজ ব্যবসায়ে জড়িত, যদিও স্ত্রীর 'সানরাইজ শিপিং কোম্পানির' তুলনায় চোখে খোঁচা মারার মত নিতান্তই ছোট সেটা। বিয়ের মাত্র একদিন পর বাবা মারা যাওয়ায় ব্যবসা বুঝে নিতে হয়েছে ক্লারিসাকে, ফলে হানিমুনে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এই জন্যে মিশর যাওয়ার প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছে ওরা দু'জনেই, আনঅফিশিয়ালি 'হানিমুন ট্রিপ' ঘোষণা করেছে এটাকে।

যেমন হাসিখুশি, তেমনি আমুদে স্বভাবের মানুষ ওরা দুজন। প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছে রানার। পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি পরিচয় হয়েছে, অথচ রানার সাথে ওদের আচরণ দেখলে মনে হয় না জানি কত যুগের ঘনিষ্ঠতা।

প্রফেসর কার্টারের কেবিন করিডরের ওপাশে, রানার ডানদিকের তৃতীয় কেবিনের মুখোমুখি। জাহাজে উঠলে বরাবর যা হয়—যাত্রা শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সী সিকনেসে আক্রান্ত হলেন তিনি। টানা তিনদিন কেবিন থেকে বেরই হতে পারলেন না। মাঝেমধ্যে অবস্থা দেখতে যাওয়া বাদে বৃদ্ধকে ছাড়াই সময়টা পার করল রানা, হ্যারি ও ক্লারিসা।

ডেকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব আর অফিসার্স মেসে তাস, বিলিয়ার্ড খেলে একঘেয়ে সময় কাটতে লাগল। চতুর্থ দিন সুস্থ হলেন ডক্টর কার্টার। দুপুরের পর দলে তাঁকে পেয়ে হাঁপ ছাড়ল সবাই। এ ক'দিন অনবরত বমি ও প্রায় না খেয়ে থাকতে হয়েছে বলে যথেষ্ট শুকিয়ে গেছেন ভদ্রলোক, চেহারা ফ্যাকাসে, তবু বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনিও খুশি।

পরের তিনদিনের বেশিরভাগ সময় মিশরের প্রাচীন ইতিহাস

সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে কাটল ওদের। সপ্তম দিন দুপুরের দিকে মার্সেই ভিড়ল এস.এস. হ্যাম্পশায়ার। ফার্স্ট ক্লাসের কয়েকজনসহ প্রচুর যাত্রী উঠল।

প্রথম দলের একজন ফরাসী, দু'জন আমেরিকান ট্যুরিস্ট, সস্ত্রীক, দু'জন এশীয়, এবং একজন আরব। এশীয় দু'জনের একজনের ওপর চোখ পড়ল রানার। প্রফেসরের সারিতে চারটা কেবিনের পরের কেবিনে উঠল সে। পোশাক-আশাকে পুরো ইওরোপীয় কেতাদুরস্ত।

ছয় ফুটের ওপর লম্বা মানুষটা, একহারা গড়ন। বয়স চল্লিশের মত হতে পারে, দেখে অনুমান করা যায় না। মুখের আকৃতি ডিমের মত। নাকে হাতলবিহীন চশমা। হাতের কব্জি রানার প্রায় দেড়গুণ চওড়া, পাঞ্জাও তেমনি। ওতেই প্রমাণ হয় কি পরিমাণ শক্তি ধরে সে। অভিজাত চেহারা। সঙ্গে এক ভ্যালে আছে, তার লটবহর সামলাতে ব্যস্ত। বডি বিল্ডিঙে সম্ভবত মিস্টার ইউনিভার্স লোকটা। লম্বায় মনিবের সমান, কিন্তু দেহখানা মাশাল্লাহ্! বয়স বিশ-বাইশের বেশি হবে না।

বুনো ষাঁড়ের মত গর্দান। কোটের তলায় পেশীর নড়াচড়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। মুখ সামান্য বাঁকা, অনেকটা কুঠারের মত। লোকটার হালকা ফিরোজা চোখের শীতল চাউনি দেখলে অস্বস্তি লাগে। জাহাজের রুম সার্ভিসকে কেবিনের ভেতরে পা রাখার সুযোগই দিল না সে। গোছগাছ যা করার সব নিজেই করল।

এক ঘণ্টা পর কেবিন থেকে বেরোল বডি বিল্ডার, কোনদিকে না তাকিয়ে নিচে চলে গেল। যাত্রীটি সম্পর্কে জানতে হবে, ভাবল রানা। তেমন বিশেষ কোন কারণে নয়, সাধারণ কৌতূহল। কিন্তু ওই পর্যন্তই, ক্লারিসা নতুন এক প্রসঙ্গ তুলতে কথাটা তখনকার মত ভুলে গেল।

তিন ঘণ্টা বিরতির পর মার্সেই ছাড়ল জাহাজ। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে তখন। মেঘহীন নীল আকাশ। একটা দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। নীল সাগরের বুক চিরে আঠারো নট গতিতে এগিয়ে চলেছে এস.এস. হ্যাম্পশায়ার। প্রমিনেড ডেক প্রায় খালি হয়ে এসেছে, যাত্রীরা যে যার কেবিনে ফিরে গেছে ডিনারের জন্যে তৈরি হতে। ওরাও উঠল।

দু'দিন পর ফর্মালিটির ঝামেলা এড়াতে হ্যারি-ক্লারিসার স্টেটরুমে ডিনার সারল ওরা সবাই। এরপর প্রফেসর রাতের মত বিদেয় নিলেন, রানা উঠল দশটার দিকে। কেবিনে এসে শুয়ে পড়ল সর্বশেষ সংখ্যা টাইমস নিয়ে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, টেরই পেল না।

রাত আড়াইটার দিকে আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। কেন ভাঙল জানে না। পুরো চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, পরিপূর্ণ সজাগ। ঘুমের রেশমাত্রও নেই। কেন ভাঙল গভীর ঘুমটা? নিজেকে প্রশ্ন করল ও। বেডসাইড ল্যাম্প জ্বেলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, এ মুহূর্তে বড্ড বেশি চোখে লাগছে আলো।

তবু ওটা অফ করল না রানা। চারদিকে নজর বোলাবার ফাঁকে একই কথা ভাবছে, কেন ভাঙল ঘুম? কেবিনে চোর ঢোকেনি, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে? কেউ নক্ করেছে দরজায়? না। করে থাকলে এরমধ্যে আবারও করত। টেলিফোন বেজেছে? না। সে ক্ষেত্রেও আবার বাজত। তো? গভীর ঢেউয়ে দুলছে জাহাজ।

আস্তে আস্তে উঠে বসল ও। ঠিক তখনই একজোড়া ভারী পায়ের দৌড়ের আওয়াজ উঠল বাইরে, পায়ের মালিক যে আওয়াজটা চাপা দিতে চেষ্টার ত্রুটি করছে না, তাও স্পষ্ট বোঝা গেল। দূরে সরে যেতে যেতে মুহূর্তের জন্যে থামল আওয়াজটা,

একটা দরজা বন্ধ হওয়ার মৃদু আওয়াজ উঠল, তারপর আবার সেই পা টিপে দৌড়। পিছনের গ্যাংওয়েের দিকে যাচ্ছে।

ওর নিজেরই অজান্তে শরীরের রিফ্লেক্স কাজ শুরু করে দিল, চোখের পলকে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে ওয়ালথারটা বের করে আনল রানা, পরমুহূর্তে দুই লাফে দরজার কাছে পৌঁছে ঝটকা মেরে খুলে ফেলল। উঁকি দিল বাইরে। কেউ নেই—সিলিঙের ঘোলা আলোয় করিডরের এ-মাথা ও-মাথা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা। খোলা বাতাসে শীত শীত লেগে উঠল। ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল রানা।

চোখ কুঁচকে আছে চিন্তায়। ব্যাপার কি! এক এক করে দু'দিকের দরজাগুলোর ওপর চোখ বোলাল ও, সব বন্ধ। এঞ্জিনের একটানা গোঁ-গোঁ আর বাতাসের মৃদু গোঙানি ছাড়া কোথাও সাড়াশব্দ নেই। ফিরে আসতে যাচ্ছিল ও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, হঠাৎ কি খেয়াল হতে থেমে গেল, প্রফেসরের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। দেখে সন্দেহ হওয়ার মত কিছু নেই, ওটাও বন্ধ। তবু কেন যেন খুঁত-খুঁত করে উঠল মন।

চুরি হওয়ার মত দামী কিছু নেই তাঁর কাছে, কেবল হেরু-টেমের কবর ফলকের অর্ধেকটা ছাড়া। কেউ কি...ভাবনা শেষ করতে পারল না ও, ঢেউয়ের আঘাতে উল্টোদিকে সামান্য কাত হলো জাহাজ, এবং ওর বিস্মিত চোখের সামনে একটু একটু করে খুলে গেল প্রফেসরের কেবিনের দরজা। ওটা খোলা! জাহাজ কাত হয়ে ছিল বলে বন্ধ মনে হচ্ছিল। পুরো খুলে গেল দরজা। ভেতরটা অন্ধকার। ছাঁৎ করে উঠল বুক। একটু পর জাহাজ আবার এদিকে কাত হতে শুরু করল, নিঃশব্দে বুজে আসতে লাগল দরজা।

দ্রুত এগোল রানা, খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই

মুখ টেনে নিল। না, গুলি হলো না। অন্য কোন রকম আক্রমণও এল না। তবু আবারও একই কাজ করল ও, তারপর ঢুকে পড়ল কেবিনে। অজানা আশঙ্কায়, উত্তেজনায় ধড়ফড় করছে বুক। আলো জ্বেলে দিল, পরক্ষণে থমকে গেল ভেতরের দৃশ্য দেখে। দু'হাতের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন প্রফেসর কার্টার, তাঁর দুই শোল্ডার ব্লেডের ঠিক মাঝখানে আমূল গেঁথে আছে বড় এক ছোরা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে কার্পেট। পরীক্ষা করার দরকার হলো না, এক পলক দেখেই রানা বুঝল বেঁচে নেই মানুষটা। সারা ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।

বৃদ্ধের বড় ট্রাঙ্কটার তালা ভাঙা, সামনেই হাঁ হয়ে আছে ওটা। ভেতরের কাপড়-চোপড় সব বাইরে। ওর মধ্যেই ফলকটা ছিল, রানা জানে। এখন নেই। নিয়ে গেছে খুনী।

চট্ করে দরজা লাগিয়ে দিল ও। কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থাকল মৃতদেহটার দিকে। ডান হাত মুঠো পাকিয়ে আছে বৃদ্ধের, চেহারায় বেদনার ছাপ। রক্ত এখনও পড়ছে একটু একটু, জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। ট্রাঙ্কের ওপর নজর স্থির হলো ওর। মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। এলোমেলো চিন্তা দূর করে পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবতে লাগল ও।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল, কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এসে টেনে লাগিয়ে দিয়ে হ্যারি-ক্লারিসার দরজায় নক্ করল। ওর চাপা ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল হ্যারি, তাজ্জব হয়ে গেল ওর হাতে অস্ত্র দেখে।

'কি হয়েছে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল যুবক।

'এদিকে এসো!' বলেই হাঁটতে শুরু করল ও।

বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যারি, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে দরজা ভিড়িয়ে দিল।

‘কোথায়...’

তর্জনী ঠোঁটের কাছে তুলে তাকে চুপ থাকতে বলল রানা, ঢুকে পড়ল কার্টারের কেবিনে। হ্যারিও এল, এবং ভেতরের অবস্থা দেখে সশব্দে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু রানা সে সুযোগ দিল না, খপ্ করে বাহু ধরে টেনে নিয়ে এল ভেতরে। দরজা লাগিয়ে দিল।

চোখ কপালে তুলে নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যারি, মেঝের রক্ত আর ছোরার ওপর নজর নেচে বেড়াচ্ছে। ‘গুড লর্ড!’ ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে হুঁশ ফিরতে। ‘মরে গেছেন নাকি?’

‘কোন সন্দেহ নেই,’ গম্ভীর গলায় জবাব দিল রানা।

‘তুমি টের পেলে কিভাবে?’

ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাল ও, শুনে গম্ভীর হয়ে উঠল হ্যারি। কিছুক্ষণ ভাঙা ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘তাহলে তো সমস্ত যাত্রীর লাগেজ চেক করার ব্যবস্থা করতে হয়!’

রানা মাথা নাড়ল। ‘সেটা ঠিক হবে না, মানুষ ভয় পেয়ে যাবে, বিরক্ত হবে।’

‘তাহলে ফলকের কি হবে? ওটা না পেলে তো সবই যাবে।’

‘তা নিয়ে চিন্তা নেই। ওটা খুঁজে বের করার অন্য উপায় ভেবে রেখেছি আমি। কিন্তু সে সব পরে, আগে প্রফেসরের মৃতদেহের ব্যবস্থা করতে হবে। আসল ঘটনা যতদূর সম্ভব গোপন রাখা চাই। খুনের ঘটনা যত কম জানাজানি হবে, খুনীকে খুঁজে বের করতে তত সুবিধে হবে আমাদের।’

চোখ কুঁচকে উঠল হ্যারির। ‘তা কি করে সম্ভব? লাশ দেখলেই তো সবাই বুঝে ফেলবে কি ঘটেছে। ওটা তো আর গোপন করা যাবে না!’

দ্রুত মাথা নাড়ল রানা। ‘গোপন করার দরকার নেই। সবাই

জানবে ডক্টর মারা গেছেন। তবে হার্ট অ্যাটাকে।'

হতবিহ্বল চেহারা হলো তার। 'কিন্তু...লাশের এই অবস্থা, এত রক্ত...'

'ওসব কোন সমস্যা নয়। ফোনে ক্যাপ্টেন আর ডাক্তারকে ডাকো, তাদের আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করতে হবে। ক্লারিসাকেও নিয়ে এসো।'

দশ মিনিট পর।

প্রফেসরের বেডের এক প্রান্তে স্থাণুর মত বসে আছে ক্লারিসা, দৃষ্টি মৃতদেহের ওপর স্থির। চেহারায় এক ফোঁটা রক্তও নেই। মুখ ফোলা ফোলা, অবিন্যস্ত চুল। তার কাঁধে এক হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি। চেহারা বিষণ্ণ।

ওদের দু'হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও ডাক্তারের সাথে কথা বলছে রানা। প্রথমজন বয়স্ক, ষাটের মত বয়স। অন্যজন তার অর্ধেক বয়সী হবে। চোখে পুরু চশমা। কাঁচের জন্যে এমনিতেই বড় দেখায় তার চোখ, এ মুহূর্তে দেখাচ্ছে আরও বড়। বেশ বিচলিত। ক্যাপ্টেন ধীরস্থির। দীর্ঘ চাকরি জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা তার এবারই প্রথম নয়, তাই ঘাবড়ায়নি।

রানার কথায় থেকে থেকে মাথা দুলিয়ে সায় দিচ্ছে দু'জনেই, 'নো প্রবলেম,' 'রাইট, স্যার!' বা 'শিওর!' ইত্যাদি মন্তব্য করছে। ঝাড়া পনেরো মিনিট বলে গেল রানা। তারপর বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন, ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে পড়ল লাশের সুরতহাল রিপোর্ট লিখতে।

এই সুযোগে রানাকে একা পেয়ে এগিয়ে এল হ্যারি। 'তুমি কি করতে চাইছ আসলে, রানা? ক্যাপ্টেনকে প্যাসেঞ্জার'স লিস্ট

আনতে বললে কেন?'

'এখন না,' বলল ও। 'প্রস্তুতি শেষ হতে দাও, তারপর সব বলছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দুই বিশ্বস্ত ক্রু নিয়ে ফিরে এল ক্যাপ্টেন, ওদের একজনের হাতে নতুন কার্পেট, অন্যজনের হাতে স্ট্রেচার। এক ঘণ্টার মধ্যে কেবিনের চেহারা আগের মত স্বাভাবিক করে তুলল ওরা।

পিঠ থেকে ছোরা বের করে ক্ষতস্থান যত্নের সাথে ব্যান্ডেজ করে বৃদ্ধকে অন্য একটা শার্ট পরিয়ে দেয়া হলো, লাশটা শোয়ানো হলো স্ট্রেচারে। সব কাজ শেষ হতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রানা। ঠিক আছে। সব স্বাভাবিক।

কেবিনে উপস্থিত এই ক'জন এবং খুনী ছাড়া আর কারও বোঝার উপায় নেই কিভাবে মৃত্যু ঘটেছে স্যার কার্টারের।

তিন

হাতের তালিকাটায় ভাল করে নজর বোলাল রানা। জাহাজের প্যাসেঞ্জার'স লিস্ট ওটা। দুটো অংশ আছে তালিকায়, এক অংশে লন্ডন থেকে আসা যাত্রীদের নাম-ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি লেখা, অন্য অংশে মার্সেইর যাত্রীদের। নামগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল ও। নজর পরের অংশে ঘুরছে বেশি, বিশেষ একটা নামের ওপর।

শের খান। শের মোহাম্মদ খান। পাকিস্তানী, কূটনীতিক।

কায়রোর পাক কনসুলেটের ট্রেড অ্যাটাশে। মার্সেই থেকে ওঠা অভিজাত চেহারার যে মানুষটির ওপর রানার চোখ পড়েছিল, এ সেই লোক। তার সঙ্গীর নাম সরফরাজ, বাড়ি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

শের খান, বিশেষ করে তার সঙ্গীটিকে দেখার পর থেকেই কেমন যেন খুঁত-খুঁত করছিল রানার মন। এখনও করছে। বরং আগের তুলনায় আরও বেড়েছে তা। ঘণ্টা খানেক আগে করিডরে যার ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেছে, সে কি সরফরাজ? ভাবছে ও। হতে পারে। আওয়াজ শুনেই বোঝা গেছে মানুষটা যথেষ্ট ওজনদার।

ছুটতে ছুটতে মুহূর্তের জন্যে থেমে দাঁড়ানো, অজ্ঞাত কেবিনের দরজা বন্ধ হওয়ার মৃদু আওয়াজ, ইত্যাদির কথা ভাবল রানা। প্রফেসরের কেবিনের চারটার পর শের খানের কেবিন, ওটা থেকে লোয়ার ডেকে যাওয়ার গ্যাংওয়ে খুব কাছে। এমন কি হতে পারে, দরজা খুলে সরফরাজের অপেক্ষায় ছিল শের খান? এবং বৃদ্ধকে খুন করে পালাবার সময় তার হাতে ফলকটা তুলে দিতে মুহূর্তের জন্যে থামতে হয়েছে লোকটাকে? আর সে ওটা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে?

উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল রানা, তাই হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, শের খানই প্রফেসরের আসল খুনী। ফলকটা হাতিয়ে নেয়ার এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না লোকটার। অর্থাৎ জিনিসটা এখন তার কাছে! আবার তালিকায় চোখ বোলাল ও। এমন চট্ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হচ্ছে না। যদি শের খান সত্যিই খুনী হয়ে থাকে, কিছু করতে হলে আগে তা প্রমাণ করা চাই। নইলে সমস্যায় পড়তে হবে। ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির বলে অনেক ক্ষমতা রাখে লোকটা।

ঠিক আছে, যা কিছু করার গোপনেই করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। এতক্ষণ ওর ওপর নজর রাখছিল হ্যারি ও ক্লারিসা, ওকে তালিকাটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিতে দেখে হ্যারি বলল, 'কি বুঝলে?'

'খুনীর সন্ধান সম্ভবত পাওয়া গেছে।'

'কে সে?'

'এখন ডক্টর কার্টারের খুনের বদলা নিতে হবে।'

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল হ্যারি। 'সে না হয় হলো, কিন্তু আসল জিনিসের কি হবে?'

চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ হতভাগ্য বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলল, 'ভেবো না, ওটা পাওয়া যাবে। ক্যাপ্টেন, আলেকজান্দ্রিয়া পুলিসকে প্রফেসরের মৃত্যুর খবর জানিয়ে দিতে পারেন এখন। এ-ও বলবেন, বিশেষ কারণে "হত্যাকে" আমরা "হার্ট ফেইলিওর" বলে চালাতে বাধ্য হচ্ছি আপাতত।'

বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, ওর নির্দেশ শুনে বিস্মিত হলো। 'কিন্তু, স্যার, ওখানে পৌঁছলে এ জন্যে সমস্যায় পড়তে হতে পারে আমার। তাছাড়া লাইনারের...' থেমে সমর্থন পাওয়ার আশায় ক্লারিসার দিকে তাকাল।

'চিন্তা করবেন না,' তাকে আশ্বস্ত করতে জোর দিয়ে বলল রানা। 'কায়রোর পুলিস চীফ ইসমত পাশা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওকে ফোনে সব জানাব আমি, তখন দেখবেন আলেকজান্দ্রিয়া চীফ কতবার সালাম ঠোকে।'

'আই সী!' বিস্ময় আরও বাড়ল ক্যাপ্টেনের।

'এসব করা হচ্ছে,' বৃদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করল রানা, 'খুনীকে অপ্রস্তুত করার স্বার্থে। আর কিছু নয়। পুলিসকে তা বোঝানো

কঠিন হবে না।'

খানিক চিন্তা করে মাথা দোলাল লোকটা। 'অল রাইট দেন, স্যার!'

'থ্যাঙ্ক ইউ! জাহাজের নোটিস বোর্ডেও খবরটা টাঙাবার ব্যবস্থা করুন। ওটায় স্রেফ হার্ট অ্যাটাকের কথা থাকবে। আর যে দুই ক্রু আসল ঘটনা জানে, ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন মুখে যেন তালাচাবি মেরে রাখে।'

'শিওর, স্যার!'

ভোর চারটা। দিনের আলো ফুটতে আর বেশি দেরি নেই। স্টেটরুমে মুখোমুখি বসে আছে রানা ও হ্যারি-ক্লারিসা। ক্লারিসার মন ভাল নেই, বাবার মৃত্যুর খবর পেলে সিলভির কি প্রতিক্রিয়া হবে, তাই ভাবছে।

রানা ভাবছে অন্য কথা—ফলকটার কথা ওরা চারজন ছাড়া আর কেউ জানত না, তাহলে খবরটা ফাঁস হলো কি করে? কেউ পিছু লেগে ছিল বৃদ্ধের? ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে জিনিসটা বাইরে আসার অপেক্ষায় ছিল? কে সে, ফিলিপ? ইদানীং তাকে নাকি কায়রোয় দেখা যাচ্ছিল না, হতে পারে হয়তো লন্ডন ফিরে এসেছিল বৃদ্ধের ওপর নজর রাখতে। সময় বুঝে অন্যের সাহায্যে ছোবল মেরেছে।

সিলভির কথা ভেবে আফসোস হলো খুব। পৃথিবীতে বাবাই ছিল একমাত্র আপনজন, তাকে এভাবে হারানোর কষ্ট সহ্য করা খুব কঠিন হবে ওর পক্ষে। তা আরও বাড়বে যদি ওর অনুপস্থিতিতেই আলেকজান্দ্রিয়া পুলিস বৃদ্ধকে কবর দিয়ে ফেলে। ইসমত পাশাকে সে ব্যাপারেও কিছু একটা ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করতে হবে।

ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে ওদের সাথে ঘণ্টাখানেক পরামর্শ করে উঠল রানা। কেবিনে ফিরে কিছু সময় বিশ্রাম নিতে হবে, মাথাও ঘামাতে হবে খানিকটা। কিন্তু বেরিয়ে এসে মত পাল্টাল ও, খোলা ডেকে এসে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। কানের পাশ দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস, নিচে কলকুল আওয়াজ তুলছে সাগর। আকাশে একটা-দুটো তারা জ্বলছে টিমটিম করে, আলো ফুটতে শুরু করার সময় হয়ে এসেছে। কবি-সাহিত্যিকদের জন্যে চমৎকার পরিবেশ, কিন্তু রানা এর কোনটাই নয়। তাই পরিবেশ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছে না ও, ভাবছে অন্য কিছু।

সিগারেট ধরিয়ে গোটা ব্যাপারটা প্রথম থেকে আরেকবার নাড়াচাড়া করল। হেরু-টেমের কবর ফলক কেড়ে নিতে কায়রোয় দু'দফা ডক্টর কার্টারের ওপর ব্যর্থ হামলা চালিয়েছিল তাঁর সহকারী, ফিলিপ বয়েল। আজ চালিয়েছে তৃতীয় দফা, এবং সফল হয়েছে। ফলকটা ওদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও।

ফিলিপ কে, দেখতে কেমন, কিছুই জানা নেই ওর। জাহাজেই আছে সে, ছদ্মবেশে? অথবা ছদ্ম পরিচয়ে? মাথা দোলাল ও, থাকলে ছদ্মবেশেই আছে। নইলে ডক্টরের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। আর শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণ হয় শের খানের ভ্যালেই বৃদ্ধের খুনী, তাহলে বুঝতে হবে লোকটা আদৌ জাহাজে নেই। ওঠেনি।

বৃদ্ধের প্ল্যান যে-ভাবে হোক, জেনে নিয়ে জায়গামত খবর পাঠিয়ে দিয়েছে সে। কুকর্মের সঙ্গীরা তৈরিই ছিল, ফলক উদ্ধার করতে তাদের সমস্যা হয়নি। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে খুনী মার্সেই শহরেই অপেক্ষায় ছিল। এইখানটায় খটকা লাগে, সন্ধানদাতা কি করে জানল ডক্টর এই জাহাজেই মিশর

যাবেন?

জবাবটা নিজেই খুঁজে নিল ও। কার্টারের ছাত্র এবং একান্ত সহকারী হওয়ায় নিশ্চয়ই তাঁর ও সিলভির ঘনিষ্ঠ ছিল ফিলিপ, তাদের সব খবরই জানত। কাজেই বৃদ্ধকে লন্ডনে ক্লারিসার সাথে যোগাযোগ করতে দেখে বুঝে নিয়েছে যা বোঝার। এবং তার কাছ থেকে খবর পেয়ে মাঝপথে এসে ঘাপটি মেরে ছিল খুনী।

আপনমনে মাথা দোলাল ও, হতে পারে। সে সম্ভাবনাই বেশি। কারণ তাতে নিজেকে গোপন রেখে কাজ সারতে সুবিধে, এবং ফিলিপের তা না বোঝার কথা নয়।

সিধে হলো রানা, টোকা মেরে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে দিল। এখন ও নিশ্চিত, শের খানই ফিলিপের দোসর; ডক্টরের খুনী। ব্যাটাকে সাইজ করতে হবে। আগামী পরশু আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছবে ওরা, তার আগেই খোয়া যাওয়া ফলকের খোঁজ বের করতে হবে।

তার উপায় নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতেই চমৎকার একটা পথ বেরিয়ে এল। পিলে চমকানো ক্রূর হাসি ফুটল ওর মুখে। মনে মনে বলল, দাঁড়াও! মজা দেখাচ্ছি।

বিছানায় পিঠ লাগানোমাত্র ঘুমে বুজে আসছে দেখে জোর করে চোখের পাতা টেনে মেলে রাখল ও, কাজ হলো না। একটু সুযোগ পেলে অজান্তেই ফের বুজে আসে। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর বিরক্ত হয়ে উঠে বসল। সকাল হয়ে এসেছে, এখন ঘুমালে এমনিতেও উঠতে দেরি হয়ে যাবে, প্রথম সুযোগটা নষ্ট হবে। কিন্তু ও ব্যাটা বের হবে তো? যদি না হয়? দেখা যাক্।

ঝিমঝিম ভাব কাটানোর জন্যে বিছানা ছাড়ল রানা, সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি শুরু করল। বাসি মুখে বিস্বাদ লাগছে ধোঁয়া, তবু

টেনে চলল। আধঘণ্টা হাঁটাহাঁটির পর ঘড়ি দেখল, সময় হয়ে এসেছে। ফোনে হ্যারির কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে ওর সাথে দু'মিনিট কথা বলল রানা, তারপর বাথরুমে ঢুকল। রাত জাগার ক্লান্তি ও উদ্বেগ দূর করতে প্রচুর সময় নিয়ে শাওয়ার-শেভ সারল। ব্রেকফাস্টের জন্যে তৈরি হয়ে যখন বের হলো, তখন সোয়া আটটা বাজে। ঠিক ন'টায় ব্রেকফাস্ট গং বাজবে।

তিন বেলার খাওয়া সাধারণত ডাইনিং হলেই সারে সবাই। তাতে অন্যদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, গল্প করা যায়, সুযোগ পেলে পরস্ত্রীর সাথে খুচরো প্রেমের সম্পর্কও গড়ে তোলা যায়। অবশ্য অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে কেউ যদি যেতে না চায়, তার খাবার কেবিনেই পৌঁছে দেয়া হয়।

রানার ধারণা শের খান ডাইনিং হলে খাওয়াই পছন্দ করবে ইচ্ছে না থাকলেও। সে নিশ্চয় বোঝে তার জাহাজে ওঠার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটা খুন হওয়ায় তার ব্যাপারে সন্দেহ জাগতে পারে কর্তৃপক্ষের মনে। সেটা যাতে বাড়ার সুযোগ না পায়, সে জন্যে তার পক্ষে সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রানার ইচ্ছে ব্যাটা বের হোক, তবে ষাঁড়টাকে যেন কেবিনের পাহারায় বসিয়ে না রাখে।

ঠিক সময়ে গং বাজল, যাত্রীরা একজন-দু'জন করে বের হতে লাগল কেবিন থেকে। সামনের প্রমিনেড ডেকে বসে তাদের সবার ওপর সতর্ক নজর রাখছে মাসুদ রানা। ওর সামান্য দূরে বসা হ্যারি ও ক্লারিসা–দু'জনের হাতেই ম্যাগাজিন। দেখে মনে হয় একমনে পড়ছে, আসলে কিনারার ওপর দিয়ে করিডরের ওপর নজর রাখছে। চোখে সানগ্লাস পরে আছে বলে বোঝা যায় না। একটুপর ফুল বাবু হয়ে বের হলো শের খান।

একদম সতেজ চেহারা। ভারিক্কি চালে এগিয়ে আসতে লাগল

সে প্রফেসরের বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে। মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল রানার, ওটার দিকে মনের ভুলে হলেও একবার অন্তত তাকাবে। কিন্তু পূরণ হলো না ওর আশা। তাকাল না। সামনের সংক্ষিপ্ত গ্যাংওয়ে বেয়ে নেমে বো বরাবর ওপরের ফার্স্ট ক্লাস ডাইনিং হলে ঢুকে পড়ল। সত্যি ঢুকেছে কি না রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা। ঢুকেছে।

তবু নড়ল না ও। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চায়। কারণ ও জানে সরফরাজ ভেতরে আছে। আগের দু'দিনই দেখেছে, ঠিক সকাল আটটায় এসে শের খানের ঘুম ভাঙায় লোকটা। তারপর ভেতরে গিয়ে সম্ভবত তার গোসলের জন্যে বাথটাব রেডি করে, ড্রেস-জুতো গুছিয়ে দেয়। শের খানের মিনিট পাঁচেক পর বের হয় সে।

আজও তাই ঘটল, ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় দরজায় দেখা দিল লোকটা। এগারোটার দিকে আবার আসবে মনিবের ডিনারের ড্রেস গুছিয়ে দিতে। লোকটা করিডরের ও মাথায় অদৃশ্য হয়ে যেতে দ্রুত পা চালাল রানা। সবাই নাস্তা খেতে বেরোলে স্টুয়ার্ড আসে কেবিন ঝাড়পোছ করতে, তাই দরজায় তালা লাগানো হয় না।

কাজেই কোন সমস্যায় পড়তে হলো না ওকে, ফাঁকা করিডর পেরিয়ে এসে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দম নিল লম্বা করে। দ্রুত চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল। সময় বেশি পাওয়া যাবে না, যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ফলকটার আকার-আকৃতি জানা আছে, দেখেছে ও। গ্র্যানিট পাথরের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি ওটা—বিশ ইঞ্চি চওড়া, দৈর্ঘ্য ত্রিশ ইঞ্চি। অমন এক জিনিস লুকিয়ে রাখার মত জায়গা কমই আছে

কেবিনে। চমৎকার পালিশ করা কাবার্ডের পাশে বড় এক সুটকেস দেখে সেদিকে পা বাড়াল রানা। তুলে ওজন পরীক্ষা করে দেখল। নাহ্, এটার মধ্যে নেই। ওয়্যারড্রোবের দিকে নজর দিল এবার।

একদিকে কয়েকটা ড্রয়ার, অন্যদিকে শার্ট-কোট ঝুলিয়ে রাখার চেম্বার। ড্রয়ারে নেই, থাকলে চেম্বারে আছে, নিচে। ঝটপট ওটাও সার্চ করল রানা, নেই। ওটার ওপরে একটা চামড়ার হ্যাট-বক্স ও একটা স্টীলের ফ্ল্যাট ডেসপ্যাচ ব্যাগ আছে, ওগুলোর দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না। ওগুলো ছোট। আর মাত্র একটা জিনিস আছে যার মধ্যে ফলকটা থাকা সম্ভব।

বড় এক কেবিন ট্রাঙ্ক সেটা, বেডের নিচে। টেনে ওটা বের করল রানা, এক মাথা উঁচু করে ওজন বোঝার চেষ্টা করল। খুব ভারী! বুকের মধ্যে ধড়াশ করে উঠল ওর—এর ভেতরে শুধু কাপড়-চোপড় থাকার কথা, অন্য কিছু নয়। তার মানে ওর ধারণাই সত্যি! শের খানই খুন করেছে বৃদ্ধকে!

তালা ঝুলছে ওটায়। কিন্তু ওই তালা খোলা কোন সমস্যাই নয়। পকেট থেকে তালা খোলার স্টীলের ইংরেজি Y-এর মত একটা পাত বের করল রানা। ওপরদিক চ্যাপ্টা ওটার, কিছুটা বাঁকা। ওটা দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তালা খুলে ফেলল। ঝটকা মেরে ডালা তুলে ভেতরে হাত ভরে দিল।

আছে!

ওপরদিকে কিছু শার্ট-প্যান্ট ইত্যাদির নিচে আছে জিনিসটা। স্যাকিং দিয়ে মোড়া। আবরণের ওপর দিয়ে আঙুলে স্ল্যাবের হিমশীতল ছোঁয়া পেল রানা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মন আর কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল হয়তো, তাই শব্দটা শুনে চমকে উঠল প্রথমে।

দরজা খুলছে কেউ! স্টুয়ার্ড বোধহয়। ট্রাঙ্ক বন্ধ করার সুযোগ

হলো না, তড়াক করে উঠে পড়ল রানা, পা দিয়ে গুঁতো মেরে ট্রাঙ্কটা ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বাথরূমের দিকে যাওয়ার জন্যে পা তুলল, এই সময় কে যেন ডেকে উঠল, 'হেই, ইউ! কাম হিয়ার!'

বুকের মধ্যে ধড়াশ করে লাফিয়ে উঠল রানার, ভেবেছিল ওকেই ডাকছে বুঝি, কিন্তু না। ওটা হ্যারির গলা, স্টুয়ার্ডকে ডাকছে। সেরকমই প্ল্যান ছিল, দুয়েক মিনিটের জন্যে লোকটাকে আটকে রাখবে ও। কিন্তু ডাক দিতে দেরি করে ফেলেছে যে কারণেই হোক। দম আটকে অপেক্ষায় থাকল রানা, যখন নিশ্চিত হলো লোকটা হ্যারির দিকে এগোচ্ছে, ছোঁ মেরে তালাটা তুলে নিয়ে ট্রাঙ্ক আটকে দিল। দামী টিপ তালা লেগে গেল 'কুট্' করে।

সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিল ও, লম্বা পায়ে দরজার দিকে এগোল। দরজা সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকাল, দেখতে পেল এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে স্টুয়ার্ড। হাতে লম্বা এক ঝাড়ু, কাঁধে কাপড়ের ডাস্টার। চট্ করে বেরিয়ে এল রানা, আলগোছে দরজা লাগিয়ে দিয়ে প্রমিনেড ডেকের দিকে এগোল ভদ্রলোকের মত।

ওর গোপন অভিসারের কথা শের খান টের পাবে না ভেবে নিশ্চিন্ত। জানে না একটা জিনিস ওর চোখ এড়িয়ে গেছে, এবং ওটা দেখেই সে টের পেয়ে যাবে কেউ এসেছিল তার কেবিনে।

হাত নেড়ে স্টুয়ার্ডকে বিদেয় করে দিল হ্যারি, রানার উদ্দেশে চাপা গলায় বলল, 'আছে ওটা?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও।

'বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চাপল যুবক। 'টের পাবে না তো ব্যাটা?'

'মনে হয় না। স্টুয়ার্ডকে আরেকটু আগে ঠেকানো গেলে নিশ্চিত হয়ে নিতে পারতাম। দরজার বাইরে লোকটার উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'সরি! দূর থেকে প্রথমে বুঝতে পারিনি ব্যাটা ওই কেবিনেই ঢুকতে যাচ্ছে। তবু ভাল যে বেশি দেরি করে ফেলিনি।'

ডেকের এক প্রান্তে বসল ওরা তিনজন। এর মধ্যে লোকজন ফিরে আসতে শুরু করেছে, প্রফেসরের মৃত্যুর খবর জানাজানি হওয়ায় জটলা বাড়ছে তাঁর কেবিনের সামনে। জাহাজের চীফ পার্সার দরজায় দাঁড়িয়ে জনে জনে ব্যাখ্যা করছে তাঁর মৃত্যুর কারণ।

একটু পর শের খান উঠে এল। জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আর দশজন দর্শকের মতই উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখল, একটা-দুটো প্রশ্ন করল পার্সারকে, তারপর আরও দুয়েকবার উঁকিঝুঁকি মেরে নিজের কেবিনে ঢুকে গেল। খানিক পরই একটা ম্যাগাজিন হাতে বেরিয়ে এল লোকটা, রানাদের কাছ থেকে একটু দূরে বসে পড়ায় মন দিল। আর একবারও তাকাল না কার্টারের কেবিনের দিকে। রানার ধারণা ছিল খুনটা হঠাৎ 'হার্ট অ্যাটাক' হয়ে গেল দেখে কিছু না কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করবে সে, কিন্তু না। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'ব্যাটা দেখছি গভীর পানির মাছ!' ফিসফিস করে বলল হ্যারি।

'হুঁম!' গম্ভীর জবাব দিল রানা।

'ও মনে হয় ভাবছে "বাঁচা গেল",' ক্লারিসা বলল। 'নইলে...'

'ঠিক উল্টো,' মাথা নাড়ল রানা। 'ও ভাবছে প্যাঁচটা লাগাল কে। প্রফেসরের সঙ্গে ফলকটা আছে, এ খবর যখন জানে লোকটা, তখন এ-ও জানে যে আমরাও তাঁর সঙ্গে আছি। ও এখন মনে মনে আমাদের ওজন করছে। বোঝার চেষ্টা করছে আইডিয়াটা কার মাথা থেকে বের হলো।'

'তুমি থট্ রীডিং জানো মনে হচ্ছে!' বিস্ময় ফুটল মেয়েটির

চেহারায়।

'কিছু কিছু। তবে এ ক্ষেত্রে থট্ রীডিং বিদ্যের কোন প্রয়োজন হয় না। ওর দিক থেকে চিন্তা করলে তুমিও বুঝতে পারবে এমন সময় লোকটার মাথায় কি ভাবনা ঘোরা স্বাভাবিক।'

কিছু সময় নীরব থেকে মাথা দোলাল মেয়েটি। 'ঠিকই বলেছ।'

'ও এখন আমাদের পরবর্তী চাল কি হবে, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে। বিকেলে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছবে জাহাজ, তখন যাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন প্যাঁচে পড়তে না হয়, সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'ক্যাপ্টেনকে দিয়ে ওখানকার পুলিসকে ইনফর্ম করালে হয় না, যাতে ওরা নামার সময় ব্যাটার লাগেজ চেক্ করে?' হ্যারি প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল রানা। 'তাতে কাজ হবে না। ও ডিপ্লোম্যাট। ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির বলে অনায়াসে বিনা চেকিঙে মাল ছাড়িয়ে নিতে পারবে।'

'তাহলে? ফলকটা উদ্ধার করার উপায়?'

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল ওর। 'উপায় একটাই, সময়মত হারামজাদার ঘাড় চেপে ধরে কেড়ে নেয়া। কিন্তু আগে দেখতে হবে ও কার হয়ে কাজ করছে। আর কে কে আছে ওর সঙ্গে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' সন্তুষ্টি ফুটল হ্যারির চেহারায়।

ক্লারিসার নীল চোখ বড় হয়ে উঠল। 'প্রথমে ছিল হানিমুন-কাম-অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপ। এখন তার সাথে যোগ হয়েছে থ্রিল। মন্দ নয়।'

'আরও আছে,' রানা বলল। 'খুব শিগগিরি ওসবের সাথে দু'চারটা খুন-খারাবিও যোগ হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে এখন। আগে নাস্তা

খেয়ে নিই।'

লাঞ্চ খেয়ে প্যাক করতে যাওয়ার আগে কিছু সময়ের জন্যে ডেকে বসল ওরা। শের খান মিনিট দশেক পর উদয় হলো ডেকে, নিচের হল থেকে খেয়ে এসেছে। সঙ্গে ষাঁড়টাও আছে। কোনদিক না তাকিয়ে সোজা কেবিনে গিয়ে ঢুকল ওরা। সেই যে ঢুকল, সন্ধের আগে দু'জনের একজনও আর বের হলো না। পুরোটা সময় কেবিনের বন্ধ দরজার ওপর পালা করে নজর রাখল রানা ও হ্যারি। ওর ফাঁকে পরবর্তী প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা করে নিল।

তিনটের দিকে দেখা দিল আলেকজান্দ্রিয়া। পরের এক ঘণ্টা ধরে সাগর থেকে একটু একটু করে শহরটাকে জেগে উঠতে দেখল ওরা। জীবনে এই প্রথম মিশর আসা হ্যারি-ক্লারিসার; এ দেশের কোন শহর এত সুন্দর, এত বড় হতে পারে কল্পনাই করেনি কখনও, তাই প্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। নব্য ট্যুরিস্টের মত থেকে থেকে নানান বিস্ময়সূচক মন্তব্য করতে লাগল এটা-ওটা দেখে।

সাতটা উপসাগর মিলে তৈরি পেনিনসুলার মুখে দীর্ঘ তেরো মাইল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী আলেকজান্দ্রিয়া। সাগরতীরেই তার যত জৌলুস, ইনল্যান্ডের চেহারা সম্পূর্ণ উল্টো। পুরানো আমলের শ্রীহীন ঘরবাড়ি আর ভাঙাচোরা রাস্তা ওখানে। ইতিহাসের জ্ঞান ঝাড়ার সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা, বলে যেতে লাগল।

আলেকজান্দ্রিয়া কখনোই সত্যিকারের মিশরীয় শহর ছিল না। গ্রীক বীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এ দেশ দখল করার পর শহরটার পত্তন করেন, তাই ওটার নাম আলেকজান্দ্রিয়া। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে মেসিডোনিয়ান সাম্রাজ্য টকরো টুকরো হয়ে

যায়, সে সময় তাঁর এক সেনাপতি; টলেমি, দেশটিকে তাঁর সাম্রাজ্যের অংশ করে নেন। টলেমি ও তাঁর উত্তরসুরিরা তিনশো বছর শাসন করেন আলেকজান্দ্রিয়া।

তাঁরাও গ্রীক ছিলেন, কাজেই শহরটিও গড়ে ওঠে গ্রীক ধাঁচে, নিউ ইয়র্ক যেমন গড়ে উঠেছে অ্যাংলো-স্যাক্সন ধাঁচে, তেমনি। তার পরের কয়েক শতাব্দী রোমান, আরব, তুর্কি, ফরাসী ও ইংরেজরা কর্তৃত্ব করে এখানে, ফলে বারে বারে, বহুজাতীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন নিয়ে গড়ে উঠেছে আলেকজান্দ্রিয়া। তবে গ্রীকরাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

সাত উপসাগরের মিলিত ওয়াটার ফ্রন্ট সাগর থেকে সনাক্ত করা কঠিন কাজ, তবু কষ্টেসৃষ্টে খুঁজে বের করল রানা। বেলভিল দম্পতিকে দেখাল, ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ মার্ক অ্যান্টনির সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত শহরের কোন অংশে বসে রাজ্য শাসন করত টলেমিরা। আজও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটা, কাইত বে-র বিশাল লাইট হাউস।

'গড!' অস্ফুটে বলল হ্যারি। 'ওটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'আর ওটা কি?' টাওয়ারের সামান্য দূরের প্রকাণ্ড এক আধুনিক ভবন দেখাল ক্লারিসা।

'হোটেল সেসিল।'

ক্লিয়ারেন্স না পাওয়ায় ঘণ্টাখানেক হারবারে দাঁড়িয়ে থাকল হ্যাম্পশায়ার, এই ফাঁকে ওদের শের খানের পাহারায় রেখে ক্যাপ্টেনের সাথে আধঘণ্টা আলোচনা করে এল রানা। পুলিসকে কি কি বলতে হবে, ভাল করে শিখিয়ে দিয়ে এল। ছ'টার পর জেটিতে ভিড়ল জাহাজ। ততক্ষণে আঁধার হয়ে আসতে শুরু করেছে, বেশ দ্রুত রাত নামছে। নিচ থেকে জোরাল কোলাহলের

আওয়াজ আসছে, নিচের যাত্রীরা গ্যাংওয়ের মাথায় জড় হতে শুরু করেছে।

প্রচুর পোর্ট অফিশিয়াল ও পুলিস উঠল জাহাজে, কয়লার মত কালো থেকে হালকা বাদামী, সব রঙের নিগ্রো আছে তার মধ্যে। ব্যতিক্রম শুধু চীফ অফিসার–দীর্ঘদেহী স্লিম মানুষটা, নাক বাজ পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা। গায়ের রং ফরসা, মা-বাবার কেউ একজন খুব সম্ভব ইওরোপীয় হবে। চীফ পার্সার এগিয়ে গেল তাদের দিকে, দলটাকে ক্যাপ্টেনের কেবিনের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

শের খানের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। খোলার লক্ষণ নেই এখনও। ব্যাটা করছে কি ভেতরে! জেটির দিকে তাকাল, একদল পুলিস যাত্রীদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসারের হুকুম না পেলে যেতে দেবে না। হঠাৎ একটা মোটরের গম্ভীর গর্জন শুনে ঘুরে তাকাল রানা। একটা শক্তিশালী মোটর বোট, ধীরগতিতে এসে পাশ দিয়ে হ্যাম্পশায়ারের গায়ে ভিড়ল।

পরক্ষণে খাটোমত, গোলগাল এক লোক দেখা দিল ওটার ডেকে। কয়েকজন লোক নিয়ে হ্যাম্পশায়ারের ডেকে উঠে এল সে মই বেয়ে। দেহের তুলনায় বেশ বড় ভুঁড়ি তার, মুখটা ফোলা, চকচকে ত্বক। মাথায় লাল তারবুশ। উঠেই ছোট ছোট পা ফেলে শের খানের কেবিনের দরজায় গিয়ে টোকা দিল সে।

'এ ব্যাটা আবার কে?' হ্যারি বলে উঠল।

রানা মাথা নাড়ল। 'বুঝতে পারছি না।'

ওদিকে বোট দেখে কয়েকজন সিপাইসহ পুলিসের এক ক্যাপ্টেন এগিয়ে আসতে লাগল। ততক্ষণে শের খানের কেবিনের দরজা খুলে গেছে, আগন্তুকের সঙ্গের লোকজন ঢুকে পড়েছে

ভেতরে। করিডরের আলোয় নিরুদ্বিগ্ন খানকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, হেসে হেসে কথা বলছে সে বেঁটেখাট আগন্তুকের সাথে।

অল্পক্ষণের মধ্যে তার হালিখানেক ছোট-বড় সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে এল বোটের লোকগুলো, ষাঁড় সরফরাজ নেতৃত্ব দিচ্ছে ওদের। ওগুলোর মধ্যে সেই কেবিন-ট্রাঙ্কটার ওপর নজর আটকে গেল রানার।

ভারী বুটজুতোর আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল বেঁটে, ক্যাপ্টেনের সাথে চোখাচোখি হতে গম্ভীর হয়ে গেল। ওদিকে তাকে চিনতে পেরে অফিসার বিব্রত হলো। 'ইওর এক্সেলেন্সি, আপনি?'

'হ্যাঁ, অফিসার।' মাথা দোলাল বেঁটে। 'আমার বন্ধুকে নিয়ে যেতে এসেছি,' মুখ ঘুরিয়ে খানকে দেখাল। 'পাকিস্তানী, ডিপ্লোম্যাট।'

'জানি, ইওর এক্সেলেন্সি, লিস্টে নাম দেখেছি,' অফিসার বলল। 'আমাদের চীফ আছেন জাহাজে, যদি দু'মিনিট অপেক্ষা করেন...'

'কেন বলুন তো?'

মুখ ফসকে খুনের কথাই হয়তো বলে বসতে যাচ্ছিল লোকটা, একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। 'কিছু না, ইওর এক্সেলেন্সি, কিছু না। এমনিই...'

'সরি!' আবারও বাধা দিল সে। "ব্যস্ত আছি, সময় নেই এখন। এসো,' শের খানের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে বোটের দিকে পা বাড়াল লোকটা। অফিসার আর কিছু বলার সুযোগই পেল না। স্যালুট করে একপাশে সরে দাঁড়াল।

অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল রানা, বলল, 'ভদ্রলোককে খুব

চেনা চেনা মনে হলো। কে উনি, বলুন তো!'

'আমাদের এক ইম্পর্ট্যান্ট ডিপ্লোম্যাট। হাবিব ইসমাইল বে।'

আর কোন প্রশ্ন না করে পিছিয়ে এল ও, আপাতত আর কিছু না জানলেও চলবে। ব্যাটারা বেপথে ভাগছে, কাজেই সেদিকে নজর দেয়া দরকার এখন। বোটটাকে অনুসরণ করার উপায় নিয়ে ভাবছে ও, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। জেটির উল্টোদিকে, হ্যাম্পশায়ারের গায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছে প্রচুর ছোট-বড় বোট। ট্যুরিস্ট গাইডদের বোট, জাহাজ থেকে অল্প খরচে গাইড করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেশীদের পাকড়াও করে ওরা।

চাঁদপুর বা বরিশাল ঘাটে বড় লঞ্চ, স্টীমার ভিড়লে এমন দৃশ্য দেখা যায়। ডাব বা কলা ফেরি করতে ভিড় করে বিক্রেতারা, ওরা অবশ্য নৌকায় আসে। ব্যস্ত হয়ে ওর মধ্যে একটা উপযুক্ত বোট খুঁজতে লাগল রানা, হাবিব ইসমাইল বে-র বোটের মই ততক্ষণে সরে গেছে হ্যাম্পশায়ারের গা থেকে। এখনই পিছাতে শুরু করবে ওটা।

এমন সময় কেউ একজন ওর নাম ধরে ডেকে উঠতে তাজ্জব হয়ে ঘুরে তাকাল রানা। একটা বোটের গলুইয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী এক নিগ্রো ডাকছে ওকে।

'মাসুদ সাহিব্! সাইদা, রানা এফেন্দি। ওয়েলকাম টু ইজিপ্ট, সাহিব, ওয়েলকাম!'

বেশ কয়েক বছর আগে পরিচয় হলেও দেখামাত্র মানুষটাকে চিনতে পারল ও। লোকটার নাম করিম, পেশায় ট্যুরিস্ট গাইড। গোটা কায়রো লোকটার নখদর্পণে। ওখানকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের চুনোপুঁটি থেকে রাঘব বোয়াল, সবাইকে চেনে। শুধু চেনে বললে ভুল হবে, তাদের রোজকার হাঁড়ির খবরও রাখে।

একবার বিশেষ এক কাজের জন্যে এরকম এক হরফুন মওলা

খুঁজতে গিয়ে ভাগ্যগুণে করিমের সাথে পরিচয় ঘটে রানার। ও যা চেয়েছে, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি সাহায্য করেছে সেবার করিম।

তাকে এখানে দেখবে কল্পনাই করেনি রানা, তা-ও এমন জরুরী প্রয়োজনের সময়। চাঁদ হাতে পাওয়ার মত খুশি হলো ও, অভ্যর্থনার জবাব দিতে ভুলে দ্রুত হাত নেড়ে বোট নিয়ে কাছে আসতে বলল তাকে। শের খানকে বহনকারী বোটটা তখন পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে, এখনই ছুটতে আরম্ভ করবে। রানার ব্যস্ততা দেখে হাসি মুছে গেল করিমের, নিজেও ব্যস্ত হয়ে অন্য বোটের গায়ে বেমক্কা ধাক্কা-গুঁতো মেরে এগিয়ে আসতে লাগল।

ওটা তখনও দশ গজ দূরে, এই সময় হাবিব বে-র বোটের গম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেল রানা, এগোতে শুরু করেছে। এখনই অন্ধকারে মিশে যাবে। হ্যারিকে করণীয় সম্পর্কে দু'চার কথা বলে রেলিং টপকে দাঁড়াল রানা, করিমের বোট নাগালের মধ্যে এলেই লাফ দেবে। ব্যাপারটা চোখে পড়তে ছুটে এল ক্যাপ্টেন।

'অ্যাই, দাঁড়ান! থামুন, যাবেন না।'

না শোনার ভান করে ঝুঁকে দাঁড়াল ও।

'এই যে!' আবার হাঁক ছাড়ল অফিসার। 'কানে কম শোনেন নাকি? বলছি না...'

'দুঃখিত, অফিসার,' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'এখন কিছু শোনার সময় নেই, পরে শুনব। তাড়া আছে আমার।'

হ্যারিকে ক্যাপ্টেনের পথ আগলে দাঁড়াতে দেখল ও, পরমুহূর্তে ঝাঁপ দিল বোট জায়গামত এসে পড়েছে দেখে। হাবিব বে-র বোট ততক্ষণে হারবার মাউথের দিকে কম করেও পঞ্চাশ গজ দূরে এগিয়ে গেছে, অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ওটাকে।

'জলদি বোট ঘোরাও, করিম! ওই বোটটাকে ফলো করো। দেখো, যেন পালিয়ে যেতে না পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল নিগ্রো লোকটা, আরেক দফা ধাক্কাধাক্কি করে পথ বের করে ছুটল ওটার পিছন পিছন। এর মধ্যে আরও দূরে সরে গেছে বোটটা, দেখা প্রায় যায়ই না বলতে গেলে। যে-কোন মুহূর্তে পুরো মিলিয়ে যাবে অন্ধকারে। খোলা পানিতে পৌঁছে ফুল স্পীডে বোট ছোটাল করিম, কিন্তু বিশেষ লাভ হলো না তাতে।

হাবিব বে-র বোট অনেক শক্তিশালী, বড়, এদিকে করিমেরটায় কম শক্তির এঞ্জিন, ফলে এঁটে ওঠা যাচ্ছে না। দুটোর দূরত্ব একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। অনেক চেষ্টা করেও সুবিধে করা যাচ্ছে না দেখে হাল প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল রানা, এই সময় হঠাৎ করে আবার দেখা দিল ওটা। শুধু তাই নয়, একটু একটু করে বড়ও হতে লাগল।

ওকে কিছু বলতে হলো না, ব্যাপার চোখে পড়ামাত্র নিজে থেকে বোটের গতি কমিয়ে দিল করিম। 'ওরা থামছে, সাহিব। ওখানে কয়েকটা কাঠের জেটি আছে, মনে হয় ওর কোনটায় ভিড়বে।'

'কিসের জেটি?' প্রশ্ন করল রানা।

'এক তুলা কোম্পানির, সাহিব। বড় বড় কয়েকটা গুদামও আছে। এখন অবশ্য ফাঁকা।' দূরে গুদাম দেখা দেয়ামাত্র এঞ্জিন অফ করে দিল করিম, গতির তোড়ে অনেকখানি এগিয়ে গেল বোট, তারপর মন্থর হয়ে এল চলা। বাতাস আর খোলের গায়ে পানির চাপড়ের আওয়াজ ছাড়া চারদিক নীরব।

গুদামগুলোর পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পুরো থেমে গেল বোট। সামনে জেটি প্রায় স্পষ্ট দেখা যায়। এ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে হাবিব বে-র বোট, ও মাথায় কয়েকটা ছায়া নড়ছে। তাকিয়ে থাকল রানা, চেনা কাঠামোগুলোকে সনাক্ত করতে বিশেষ

বেগ পেতে হলো না। শের খান, সরফরাজ আর হাবিব বে আছে, সঙ্গে আরও কয়েকজন। পরের দল মাথায়-ঘাড়ে করে শের খানের ব্যাগেজ টানছে।

লোকগুলো গুদামের আড়ালে চলে যেতে বোটে আর কেউ আছে কি না বোঝার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। যখন মনে হলো নেই, সঙ্গে সঙ্গে কাজে হাত লাগাল। ডেক থেকে লম্বা এক লগি তুলে নিয়ে বোট ঠেলতে শুরু করল, দেখাদেখি করিমও হাত লাগাল। দু'জনের মিলিত চেষ্টায় অল্প সময়ে প্রথম বোটের গায়ের সাথে ভিড়ল ওদেরটা। লগি রেখে ওটায় উঠে পড়ল রানা, করিমকে বলল, 'পনেরো মিনিট অপেক্ষা করো এখানে। এর মধ্যে আমি না ফিরলে হোটেল সেসিলে চলে যেয়ো। ওখানে দেখা হবে।'

মনে হলো কিছু একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মুখ বুজে মাথা দোলাল। জেটিতে নেমে পড়ল রানা, যথাসম্ভব নিঃশব্দে এগোল অন্য প্রান্তের দিকে। কোথাও কারও দেখা নেই। দূরে ট্রামের বেল বাজছে, গাড়ির হর্নের আওয়াজ আসছে থেকে থেকে।

যত এগোচ্ছে রানা, ওর মাথার ওপর ততই উঁচু হচ্ছে গুদাম। জেটির শেষ মাথায় একটা সরু প্যাসেজ পেয়ে ঢুকে পড়ল রানা। খানিক দূরে গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার ধুম্‌ধাম্ আওয়াজ শুনে দ্রুত পা চালাল, ভাগছে ব্যাটারা।

কিন্তু প্যাসেজ থেকে বের হতেই দীর্ঘ একটা ছায়া দেখে আঁতকে উঠে ব্রেক কষল ও। পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে শের খান ও সরফরাজ। খানের হাতে পিস্তল। 'কে তুমি? কেন ফলো করছ আমাকে?'

চার

চশমার ওপাশে চোখ কুঁচকে আছে কূটনীতিকের। 'কেন আমার পিছু নিয়েছ তুমি?' কঠিন গলায় বলল সে।

'পিছু নিয়েছি?' নিখাদ বিস্ময় মাখানো কণ্ঠে বলল ও। 'অচেনা একজনের পিছু কেন নিতে যাব আমি?'

'মিথ্যে বলছ তুমি!' গর্জে উঠল লোকটা। 'আমাকে তুমি ঠিকই চিনেছ। তুমিও হ্যাম্পশায়ারের যাত্রী ছিলে।'

'হ্যাঁ, ছিলাম। কিন্তু তাতে কি?'

'কি হয়েছে, খান?' আড়াল থেকে হাবিব বে-র গলা ভেসে এল। একটু পর দেখা দিল সে। বিস্মিত হয়ে পালা করে রানা ও খানকে দেখতে লাগল। 'ব্যাপার কি? লোকটা কে?'

'বুঝতে পারছি না!' ঘোঁৎ করে উঠল খান। অটোম্যাটিক নাচিয়ে ওকে কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত করল যাতে বোট থেকে আসা আলোয় চেহারাটা ভালভাবে দেখা যায়। দ্বিধায় পড়ে গেল রানা, ব্যাটা যদি ওকে চিনে ফেলে, তাহলে বিপদ। গুলি করতে দেরি করবে না। মনে মনে প্রস্তুত হলো ও, কয়েক পা এগিয়ে লোকটার চার হাতের মধ্যে দাঁড়াল যাতে বিপদ দেখলে সময় থাকতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার ওপর।

আলোয় ওকে ভাল করে দেখল শের খান। 'বাই জোভ!' বলে পাশে দাঁড়ানো ষাঁড়টার দিকে তাকাল। 'চিনতে পেরেছ এঁকে?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'না।'

'আরে, এ তো সেই লোক, ডক্টর কার্টার আর হ্যাম্পশায়ারের মালিক জুটির সঙ্গে ছিল। দেখোনি তুমি?'

চোখ কুঁচকে উঠল ষাঁড়ের। বিড়বিড় করে বলল, 'একজনকে ওদের সঙ্গে দেখেছি, স্যার। কিন্তু এই লোকই কি না...'

'এই লোকই, গর্দভ কোথাকার!' ধমকে উঠল খান। 'কিছু যদি মনে থাকে তোমার! এর কথাই বলেছিল ফিলিপ, কি যেন নাম?... মাসুদ...মাসুম...রানা, তাই না? তুমিই তাহলে আমার ট্রাঙ্ক খুলেছিলে, কেমন? এসব কাজে নতুন বুঝি? লিডের পিছনদিকে যে টেল-টেলস্ ছিল...'

মনে মনে জিভ কাটল রানা, ছিল নাকি? 'এসব কি বলছেন আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'কে তুমি, ভায়া?' মাথা ঝাঁকাল হাবিব বে। 'শার্লক হোমস নাকি?'

'দেখুন, অনর্থক আমাকে সন্দেহ করছেন আপনারা। জাহাজে সবারই সহযাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হয়, আমার বেলায়ও তাই ঘটেছে। আমার সাথে...'

'তা হলে বুঝতে হবে তুমি ওদের হয়ে আমাদের পিছু নিয়েছ, ওই বেলভিল দম্পতির হয়ে. রাইট?'

'ননসেন্স! আমি...'

'মোটেই না!' মাথা দোলাল শের খান। 'সে জন্যেই আরেক বোটে করে আমাদের পিছু নিয়েছ তুমি, আমি দেখেছি।'

'দেখো! তুমি কে আমি জানি না,' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'কিন্তু দয়া করে নিজের দাম আর বাড়াবার চেষ্টা কোরো না। লাভ হবে না। আমি বোটে এসেছি তার কারণ, এক বন্ধুর সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে দেখা করতে হবে। নইলে অন্য জাহাজে

আর কিছুক্ষণের মধ্যে ও ইংল্যান্ড রওনা হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছ? পুলিসকে বললে লাভ হত না, তাই তোমাদের দেখাদেখি অন্য বোট নিয়ে কেটে পড়েছি আমি। এবার দয়া করে পথ ছাড়ো, যেতে দাও আমাকে।'

আবার মাথা দোলাল লোকটা। 'দুঃখিত, বন্ধুর সাথে দেখা হচ্ছে না তোমার।'

'কেন?' যথাসম্ভব গলা শান্ত রেখে প্রশ্ন করল রানা। খানের সাথে নিজের দূরত্ব আরেকবার মেপে নিল, ষাঁড়টা কত ফাস্ট হতে পারে সেটাও আন্দাজ করে নিল।

'তোমাকে আমাদের কাজে দ্বিতীয়বার নাক গলানোর সুযোগ দিতে চাই না, তাই। যতটা গোবেচারা ভাব দেখাচ্ছ, আমার মনে হয় তুমি ততটা নও।'

ফিলিপ ওর আসল পরিচয় জানতে পারেনি ভেবে এর মধ্যেও ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা। পারলে নিশ্চয়ই এদের জানাত, সে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প না করে ওর হৃৎপিণ্ডে একটা গুলি ঢুকিয়ে অনেক আগেই নিশ্চিন্তে চলে যেত লোকটা।

যা হয়নি, তা হয়নি, ভাবল ও। কিন্তু এখন যা হতে যাচ্ছে, তা ঠেকানোর কি উপায়? হাবিব বে-র দিকে ফিরল শের খান, আরবীতে দ্রুত বলতে লাগল, 'মনে হয় না এর হাতে আমাকে ফাঁসানোর মত কোন প্রমাণ আছে, তবে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই জানে ব্যাটা। শেষ করে দিই, কি বলো?'

মাথা দোলাল বেঁটে কূটনীতিক। 'সেটা ঠিক হবে না। পুলিসের সন্দেহ আছে আমার ওপর, তোমাকে রিসিভ করতে গিয়েছি দেখে তোমাকেও হয়তো সন্দেহ করতে শুরু করেছে ওরা। আমাদের বোট এদিকে এসেছে, পুলিস দেখেছে। ওরটাকেও দেখেছে। এই অবস্থায় ওর কিছু ঘটলে ওদের সন্দেহ বাড়তে

পারে। কাজেই এখন কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ট্রাঙ্ক খোলার ব্যাপারটা সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল খান। 'আজ সকালে একবার কেবিন থেকে বেরিয়েছি আমি, নাস্তা খেতে। কাজটা তখনই ঘটেছে। তাছাড়া প্রফেসরের খুনটাকে চালানো হয়েছে "হার্ট অ্যাটাক" বলে। বুঝতে পারছি না এসব কার কাজ।'

'তাহলে এক্ষুণি এখান থেকে সরে পড়া উচিত আমাদের,' জরুরী ভঙ্গিতে বলল বেঁটে। 'জিনিসটা শায়লার হাতে পৌঁছে না দেয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। খুন যদি করতেই হয়, সরফরাজকে দায়িত্ব দাও। আমরা কেটে পড়ি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?' শের খান বলল। 'ফিলিপ ওটা নিতে যাবে ভোরের দিকে, তার এখনও বহু দেরি। আমরা উপস্থিত থেকে কাজটা শেষ করে...'

'তুমি বুঝতে পারছ না!' বিরক্ত হয়ে বাধা দিল হাবিব বে। 'তোমার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে প্যাঁচ বেশ ভালই লেগেছে। এখন কোনরকম ঝুঁকিই নেয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া খুন হলে পুলিস লাশের পোস্ট মর্টেম করবে, তাতে খুনের সময় বের হয়ে পড়বে। যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি ঠিক সেই সময়টায় আমরা শহরে কোথাও ছিলাম, অনেক ঝুট-ঝামেলা এড়ানো যাবে তাহলে।'

'হুঁম!' মাথা দোলাল খান। 'তা অবশ্য ঠিকই বলেছ তুমি।'

'সরফরাজকে দায়িত্বটা দাও। ভাল করে বুঝিয়ে দাও আমরা চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর কাজটা সারতে হবে। তারপর শহরে ফিরবে ও। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার বোটের দু'জন প্রয়োজনে ওর সাথে থাকবে।'

'বেশ,' রাজি হলো খান। তারপর ষাঁড়ের দিকে ফিরে পাঞ্জাবীতে অনর্গল কথা বলতে লাগল।

তার কথা শেষ হতে মুখ খুলল রানা, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'তোমরা কি নিয়ে আলাপ করছ জানতে পারি? কোন্ ভাষা ওটা?'

'মঙ্গল গ্রহের,' দাঁত বের করে হাসল খান। 'আমরা কি আলাপ করেছি আধঘণ্টা পর তা জানতে পারবে তুমি, অপেক্ষা করো।'

'তার মানে?' আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ও। 'বললাম না আমার যেতে দেরি হলে...' আর বলার সুযোগ পেল না সরফরাজের হাতে বিদ্যুৎগতি খেলে যেতে। গলার পাশে শীতল, ধাতব স্পর্শ পেয়ে থেমে গেল রানা।

'শাট আপ্!' চাপা গর্জন ছাড়ল সে। ও ভয় পেয়েছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মনিবের দিকে ফিরল, হাত সরায়নি। ওভাবেই মিনিট দুই শের খানের সাথে বাক্য বিনিময় করল লোকটা। হাবিবের দুই লোক নির্দেশ পেয়ে খুঁজে পেতে বড়সড় একটা বোল্ডার খুঁজে এনে জেটির ওপর রাখল। আরেকজন বোট থেকে খানিকটা মোটা দড়ি এনে রাখল ওটার পাশে। ঠিক হয়েছে, সময়মত রানাকে খুন করে দড়ি দিয়ে পাথরের সাথে বেঁধে হারবারে ডুবিয়ে দেবে সরফরাজ।

কারও সাহায্য? প্রবলবেগে মাথা দুলিয়ে নাকচ করে দিয়েছে লোকটা। নেহি জ্বি! কোন মদদ দরকার নেই। মদদ দরকার হয় আওরাতের, মরদের নয়। আপনা মুলুক কা ভাইয়ের সাহস দেখে খুশি হলো খান।

একটু পর মালপত্র নিয়ে হাবিব আর সে শহরের দিকে রওনা হলো, অন্যরা বোট নিয়ে চলে গেল বন্দরের দিকে।

ঘোঁৎ জাতীয় আওয়াজ বেরোল সরফরাজের গলা দিয়ে, অটোম্যাটিক নাচিয়ে রানাকে জেটির দিকে যেতে বলল সে। পা

বাড়াল ও, আর কিছু না হোক, শত্রু এখন একজনই ভেবে কিছুটা আশ্বস্ত। কি উপায়ে ষাঁড়টাকে ঘোল খাওয়ানো যায়, ভাবতে ভাবতে জেটিতে পা রাখল। সামনে তাকিয়ে করিমের বোট খুঁজল। নেই ওটা, চলে গেছে। লোকটাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলা উচিত ছিল, ভাবল রানা। ও থাকলে এখন হয়তো কাজে লাগত। সঙ্গে সর্বক্ষণের সঙ্গী ওয়ালথারটাও এমুহূর্তে নেই। শেষ মুহূর্তে শের খান এ ভাবে সরে পড়বে জানা ছিল না বলে তৈরি ছিল না রানা। যদি…

জেটির মাঝপর্যন্ত আসতে আবার ঘোঁৎ করে উঠল সরফরাজ, দাঁড়াতে বলছে। 'এদিকে ফিরে বোসো!'

ব্যাটা একেবারে বুদ্ধু নয়, ভাবল ও। যেখানটায় ওকে থামিয়ে দিয়েছে, তার দু'দিকে শুকনো, পানির কিনারা আরও সামনে। দুশমন আচমকা পানিতে লাফিয়ে পড়ে তাকে বোকা বানাতে পারে, এটুকু ঠিকই বুঝেছে।

'বসে পড়ো!' দেরি দেখে ধমক লাগাল লোকটা।

দু'পা সামনে X-এর মত রেখে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বসল রানা। শের খানের বেঁধে দেয়া সময় অনুযায়ী আর পঁচিশ মিনিট আছে ওর আয়ু। ব্যাটাকে কিভাবে কাবু করা যায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল রানা। পাঁচ হাত দূরে অনড় দাঁড়িয়ে থাকা সরফরাজের ওপর সেঁটে আছে নজর।

ওকে ফাঁদে ফেলতে হবে, ভাবছে রানা, যে করে হোক খেপিয়ে তুলতে হবে। তাহলে এক-আধটা ভুল করে বসার চান্স আছে ব্যাটার। 'প্রফেসরকে তুমিই খুন করেছ, সরফরাজ?' বিশুদ্ধ পাঞ্জাবীতে প্রশ্ন করল ও।

রীতিমত চমকে উঠল লোকটা। হাঁ করে ঝুঁকে ভালমত দেখল ওকে। কথাটা ওর মুখ থেকেই বেরিয়েছে, নাকি ভূতের মুখ

থেকে, বোঝার চেষ্টা করছে। 'কি বললে?' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।

'জানতে চাইছি জাহাজে খুনটা কে করেছে, তুমি না শের খান?'

'তুমি কে আসলে?' অনেকক্ষণ পর পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা।

'আমি? আমি আসলে আমিই।'

'কি?'

'নেভার মাইন্ড। বললে না খুন কে করেছে?'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'মনে করো আমিই করেছি। কি করবে তুমি?'

'আমিও তাই ভেবেছি,' মাথা দোলাল রানা। 'আমার ধারণাই তাহলে ঠিক!'

'হোয়াট! তুমি ধারণা করেছ মানে?'

'ওটা একটা কথার কথা। প্রফেসরকে খুন করে পালিয়ে যাওয়ার সময় খুনীর পায়ের আওয়াজ শুনেছি আমি। তখনই বুঝেছি সে কে।'

'আচ্ছা, তারপর?' ভয় নয়, কৌতূহল ফুটল লোকটার চেহারায়। অজান্তেই এক পা কাছে চলে এল। দৈহিক শক্তি ও তারুণ্যের আত্মবিশ্বাসে ড্যামকেয়ার।

'তারপর...' নড়ে বসল ও, গোড়ালি চুলকাতে লাগল। 'তারপর ঢুঁ মারলাম শের খানের কেবিনে। ট্রাঙ্কের মধ্যে ফলকটা দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেনকে জানালাম সব।'

'ক্যাপ্টেনকে...ক্যাপ্টেনকে সব বলেছ তুমি?'

শ্রাগ করল ও। 'শের খান তাহলে মিথ্যে বলেনি, তুমি সত্যিই একটা গর্দভ।' ব্যাটা পিস্তল তুলছে দেখে আঁতকে উঠে দ্রুত বলল, 'দাঁড়াও! এখনও অনেক দেরি আছে সময় হতে। সময়ের আগে কিছু করে বসলে হাবিব বে-র আইডিয়া মাঠে মারা যাবে।

এমনিতেই অবশ্য যাবে, কারণ জাহাজ থেকে অয়্যারলেসে সব ঘটনা কায়রো পুলিস চীফ ইসমত পাশাকে জানিয়ে দিয়েছি আমি। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও...'

'গুল মারছ তুমি!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সরফরাজ। 'তাহলে জাহাজ থেকে নামতে পারতাম না আমরা।'

'এই দেখো, আবার গাধার মত কথা বলে! সেটা যাতে না হয়, শের খান আর হাবিবকে যাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা যায়, সে জন্যেই না ক্যাপ্টেনের সাথে পরামর্শ করে পরিষ্কার খুনকে "হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু" বানিয়েছি আমরা, বুঝতে পারছ না?'

'মিথ্যে কথা!' ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। 'আমি বিশ্বাস করি না। তুমি...তুমি ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছ আমাকে।'

'বিশ্বাস করা না করা তোমার মর্জি,' রানা বলল। 'কিন্তু তোমরা ফেঁসে গেছ, সব...'

'চুপ করো! যদি এসব সত্যিও হয়ে থাকে, তবু কিছু করতে পারবে না পুলিস, কোন প্রমাণ নেই ওদের হাতে। শের খান, হাবিব ইসমাইল বে ডিপ্লোম্যাট, প্রমাণ ছাড়া ওঁদের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা পুলিস চীফের বাবারও নেই।'

আরও এক পা এগোল লোকটা, রাগে বোধবুদ্ধি হারাতে বসেছে। 'বুঝতে পেরেছ তুমি?' খ্যাপার মত মাথা দোলাল। 'কেউ কিছু করতে পারবে না আমাদের।' ফোঁস ফোঁস করে দম নিল খানিক, হাতঘড়ি দেখল।

'সময় হলে এখুনি একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতাম তোমার বুকে।'

'সময় হয়েছে, সরফরাজ,' আশ্চর্যরকম শীতল গলায় বলল ও। 'পিছনে চেয়ে দেখো।' পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল, 'করিম, মারো ওকে!'

ওর ফাঁদে সম্পূর্ণভাবে পা দিল লোকটা, আঁতকে উঠে ঝট্ করে পিছনে তাকাল, এবং পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারল ওখানে কেউ নেই দেখে। চোখের পলকে সামলে নিয়ে ঘুরতে গেল সে, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। এমনিতেই দু'পা এগিয়ে এসে মাঝের দূরত্ব কমিয়ে ফেলেছিল লোকটা, বাকি দূরত্ব অতিক্রম করতে রানার সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগল না।

ঝট্ করে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল ও, অন্য পায়ে জেটিতে ভর রেখে নিজেকে সবেগে সামনে ছুঁড়ে দিল। ওদিকে ঘোরা সবে শেষ করেছে ষাঁড়টা, মাথা দিয়ে তার তলপেটের ওপর গুঁতো দিল ও। অসহ্য যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল সরফরাজ, অস্ত্র পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল কোনমতে। কিন্তু নিজের পতন ঠেকাতে ব্যর্থ হলো। হুড়মুড় করে চিত হয়ে পড়ে গেল, থরথর করে কেঁপে উঠল কাঠের জেটি।

এক হাঁটু দিয়ে তার পেটের ওপর পড়ল রানা, বুকের সমস্ত বাতাস ভুশ্ করে বেরিয়ে গেল সরফরাজের। ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল সে। সময় দিল না রানা, বাঁ হাতে তার পিস্তল ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরে ডান হাতে থুতনি সই করে ভয়ঙ্কর এক পাঞ্চ কষে দিল।

হাতের সাথে জায়গাটার সংঘর্ষে ব্যথা পেয়ে ও নিজেই গুঙিয়ে উঠল, তবে মরিয়া সরফরাজের তেমন লেগেছে বলে মনে হলো না। ঘুসি খেয়েই পাল্টা ঘুসি ছুঁড়ল সে, কিন্তু রানা সময়মত মাথা নিচু করে নিতে ঘাড়ে ঘষা খেয়ে ওপরদিকে চলে গেল সেটা। তবু যেটুকু লাগল, তাতেই মাথা ঘুরে ওঠার অবস্থা।

এবার পিস্তলের দখল নিয়ে সংগ্রাম শুরু হলো। ওর ফাঁকে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল দু'জনে, প্রাণপণে যুঝতে লাগল। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না রানা, শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

বুনো মোষের শক্তি লোকটার গায়ে। উপায় নেই দেখে আচমকা তার হাত ছেড়ে দিল রানা, একটু বিস্মিত হলো সরফরাজ, পিস্তল তুলতে গেল, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার হাত ছেড়েই ঝপ্ করে বসে পড়েছিল ও, পরমুহূর্তে দু'হাতের ওপর দেহের ভর রেখে প্রচণ্ড এক লাথি ছুঁড়ল ওপরদিকে।

একেবারে মোক্ষম জায়গায় পড়ল ওটা, ঝট্ করে সামনের দিকে দু'ভাঁজ হয়ে গেল সরফরাজ। এই ফাঁকে বিদ্যুৎ গতিতে উঠে পড়ল রানা, হাঁটু দিয়ে সজোরে তার থুত্‌নিতে মারল আবার। অন্য কেউ হলে ওই আঘাতে ঘিলু নড়ে যেত, কিন্তু পাঞ্জাবী ষাঁড়টার তেমন কিছু হয়েছে বলে মনে হলো না। অবশ্য পিস্তল উড়ে গেছে মুঠো থেকে। নিচের নরম কাদায় গিয়ে পড়ল ওটা থপ্ করে।

সেদিকে এক পলক তাকিয়ে ওর দিকে ফিরল সরফরাজ, রাগে কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। রক্ত জমে আছে থুত্‌নিতে। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে ঝুঁকে খানিক আক্রমণের মহড়া দিল যুবক, তারপর ঝাঁপ দিল। তৈরি ছিল রানা, সময়মত ঝট্ করে ডানদিকে সরে গিয়ে পাশ থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল তাকে। পরক্ষণে কানের নিচে লাথি ঝেড়ে দিল।

চোয়ালের হাড়ে শক্ত সোলের আঘাতে মাথা ঘুরে উঠল সরফরাজের, তবু ওরই মধ্যে এক গড়ান দিয়ে কাত হলো সে, হাত বাড়িয়ে ওর পায়ের কব্জি ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। পড়ে গেল রানা, পরক্ষণে বাঁদরের মত এক লাফে ওর বুকের ওপর চড়ে বসল যুবক।

সামলে নেয়ার সময় পেল না রানা, তার আগেই চোয়ালে ও মাথার পাশে দমাদম্ কয়েকটা ঘুসি খেয়ে চোখে শর্ষেফুল দেখতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে সরাতে না পেরে হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল ও, বাঁ হাতে মুখ আড়াল করে ডানহাতের

মধ্যমা উঁচু রেখে ঘুসি পাকাল, তারপর গায়ের জোরে মেরে দিল তার কণ্ঠা সই করে। মুট্ করে মৃদু আওয়াজ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল যুবক, দু'চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। অ্যাডামস্ অ্যাপেলের নরম হাড় ভেঙে বসে যাওয়ায় দম নিতে পারছে না। একটু একটু করে চেহারা বদলে যাচ্ছে সরফরাজের, হাঁ করে দম নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে, দু'হাতে গলা খাব্‌লে ধরে আছে। টলছে। বিকট ঘড় ঘড় শব্দ বের হচ্ছে গলা দিয়ে। চোখ উল্টে যাওয়ার অবস্থা।

উঠে পড়ল রানা। কাজ খতম।

'সাহিব?'

চমকে ঘুরে তাকাল রানা। করিমকে দেখতে পেল, লগি ঠেলে বোট নিয়ে তীর ঘেঁষে এগিয়ে আসছে।

'রানা এফেন্দি!' এবারের ডাকে স্পষ্ট উদ্বেগ ফুটল।

শেষবারের মত নিস্তেজ হয়ে আসা সরফরাজের দিকে তাকাল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জেটির প্রান্তের দিকে এগোল। 'করিম?'

'জ্বি, সাহিব!'

'তুমি এখানে কেন, তোমাকে না আমি ফিরে যেতে বলেছিলাম?'

'আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম, সাহিব,' জেটিতে বোট ভিড়িয়ে বলল নিগ্রো। 'কিন্তু এদিকে জোর গলার কথাবার্তা আর ধমক শুনে ভাবলাম কি ঘটছে দেখে যাই,' বলতে বলতে নেমে এল। কাছ থেকে স্থির হয়ে আসা সরফরাজের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

'একে হাবিব বে-র বোটে দেখেছি মনে হচ্ছে!'

বিস্মিত হয়ে মুখ তুলল রানা। 'হাবিব বে-কে চেনো তুমি?'

'খুব চিনি, সাহিব।'

'এখানে কোথায় থাকে সে?'

'এখানে তার বাড়ি নেই, সাহিব। এলে প্রায়ই হোটেলে ওঠে, কখনও কখনও এক বান্ধবীর ওখানেও ওঠে।'

'বান্ধবী?' বলল রানা। 'সে কে?'

'এক প্রিন্সেস, সাহিব। প্রিন্সেস শায়লা।'

একটু ভাবল ও, তারপর মাথা ঝাঁকাল করিমের উদ্দেশে। 'চলো তাহলে, ফেরা যাক্।'

পাঁচ

হোটেল সেসিলের লাউঞ্জে ওর প্রতীক্ষায় ছিল হ্যারি-ক্লারিসা, দূর থেকে রানাকে দেখতে পেয়ে জোর পায়ে এগিয়ে এল দু'জনে। কাছে এসে বুঝল ও একা নয়, আরও একজন আছে সঙ্গে।

'এ কে?' হ্যারি বলল চাপা গলায়। 'সেই বোটম্যান না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এর নাম করিম খাত্তাব।' করিমকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ও। লোকটার নীরব সালামের জবাবে মাথা নাড়ল হ্যারি।

'মনে হচ্ছে তোমার অভিসার ব্যর্থ হয়েছে,' হাসিমুখে মন্তব্য করল সে। 'চোর পালিয়ে গেছে?'

'তা বলতে পারো,' বলল রানা। 'অবশ্য কিছু সময়ের জন্যে। তবে চিন্তার কিছু নেই, ধরা ওদের পড়তেই হবে। আমি আর করিম...'

হাত তুলে বাধা দিল যুবক। 'আগে জরুরী কাজের কথা সেরে নিই, রানা। তুমি কি করতে যাচ্ছ জানি না, তবে আমি সম্ভবত জানি শের খান, হাবিব বে, এদের আজ রাতে কোথায় পাওয়া যাবে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'কি করে?'

'এ শহরের ইংরেজ কটন ম্যাগনেট ম্যাকফারসনের নাম শুনেছ? ইংল্যান্ডে তুলা রফতানী করে এখান থেকে।'

'শুনেছি, কেন?'

'জাহাজঘাটে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের,' হ্যারি বলল। 'যাত্রীদের মধ্যে পরিচিতদের খুঁজে খুঁজে তাঁর বিশেষ পার্টিতে নিমন্ত্রণ জানাতে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'তাতে কি?'

'বলছি, শোনো। ম্যাকফারসন আমার বন্ধু মানুষ, বাড়ি লিভারপুল। বিরাট ধনী, বাড়িতে এটা-ওটা নানা উপলক্ষে প্রায়ই পার্টি থ্রো করেন, চেনা-অচেনা সবার জন্যে ওপেন পার্টি। মোটামুটি দুটো পয়সা বা ক্ষমতা যার আছে, তার জন্যে পার্টির রাতে ম্যাকফারসনের দরজা খোলা।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'বুঝলাম। তারপর?'

'ঘাটে আমাদের পেয়ে মহাখুশি ভদ্রলোক। ধরে বসেছেন আজ তাঁর বাড়িতে ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি, আমাদের যেতেই হবে।' ঘড়ি দেখল হ্যারি। 'আর এক ঘণ্টা পর পার্টি শুরু হবে, তুমিও যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে। কাজেই, জলদি তৈরি হয়ে নাও।'

বিরক্ত হলো রানা। 'তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এই সময়---' ক্লারিসাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল।

'না, জনাব,' হাসল মেয়েটি। 'মাথা আমাদের ঠিকই আছে। তোমাকে যেতে বলছি এই জন্যে যে ওখানে তুমি যাদের খুঁজছ,

তারাও যাচ্ছে।'

থমকে গেল ও। চাপা কণ্ঠে বলল, 'শের খান!'

'অবশ্যই! হাবিব যাচ্ছে, ওদের এক বান্ধবী...'

'প্রিন্সেস শায়লা?' জরুরী গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'গুড লর্ড!' হ্যারি বলে উঠল। 'এ নাম কোথায় শুনলে তুমি!'

'তুমি কোথায় শুনেছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'ম্যাকফারসনের মুখে। আমি ক্যাজুয়ালি জানতে চেয়েছিলাম পার্টিতে কে কে থাকছে। জবাবে গড়গড় করে একগাদা নাম বলে গেলেন ভদ্রলোক, তার মধ্যে ওরাও আছে।'

'ম্যাকফারসন ওদের কোথায় পেল? ওরা তো বোটে...'

'আহ্-হা!' বলল হ্যারি। 'এই পার্টির সিদ্ধান্ত তো আজকের নয়। কয়েকদিন আগের। তখনই ওদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আজ ভদ্রলোক ঘাটে গিয়েছিলেন যদি ইংল্যান্ড থেকে পরিচিত কেউ আসে, তাকে নিমন্ত্রণ জানাবেন বলে। আমরা যেতে রাজি হয়েছি, তুমিও চলো।'

খানিক ভাবল রানা। 'আইডিয়া মন্দ নয়। কিন্তু ওরা আসবে কি না কে জানে?'

'তুমি আর করিম কি করতে যাচ্ছ বলছিলে?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল ও। 'ভেবেছিলাম এখান থেকে কায়রো পুলিস চীফকে ফোন করে ওকে নিয়ে ব্যাটাদের ঘাঁটি খুঁজতে বের হব। করিম ওই সার্কেলের লোকজনের খবর ভাল রাখে।'

'কাবাব মে হাড্ডি নাকি?' আড়চোখে লোকটাকে দেখল ক্লারিসা। 'নিজেও সার্কেলের?'

'না, ও আসলে ট্যুরিস্ট গাইড। আগেও করিমের সাথে কাজ করেছি আমি।' লোকটার দিকে ঘুরল রানা, আরবীতে নিচু গলায়

কথা বলল কিছু সময়, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে হ্যারির দিকে ফিরল। 'করিম তোমাদের সাথে একমত। ওর বিশ্বাস, হাবিব বে, শের খান, ওরা পার্টিতে যাবে। তবে বিশেষ কোন কারণে যদি দেখা যায় শেষ পর্যন্ত গেল না, তখন ওদের খুঁজে বের করতে পারবে ও। কোন সমস্যা হবে না।'

'তাহলে আর দেরি কিসের?' হ্যারি বলল। 'জলদি রেডি হয়ে নিতে হবে। চলো, চারতলায় রুম নেয়া হয়েছে। ও হ্যাঁ, এখানকার পুলিস চীফের সাথে কথা বলেছি আমি। ভদ্রলোক স্যার কার্টারের মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার ব্যাখ্যার অপেক্ষায় আছেন।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তোমরা রুমে যাও, আমি কায়রো চীফকে ফোন করে আসছি।'

'কিন্তু তোমার অভিসারের ফল কি হলো, তা তো বললে না!' ক্লারিসা বলল। 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'এখন না, পরে বলব।'

আধঘণ্টা পর।

হোটেলের বাথরুম থেকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা–পরনে আরব আন্ডারগার্মেন্টিস, তার ওপরে দামী স্ট্রাইপড় সিলকের জোব্‌বা, মাথায় লাল রঙের তারবূশ।

কায়রোয় ফোন করার আগে করিমকে জিনিসগুলো কিনে আনতে পাঠিয়েছিল ও। শুধু নিজেরগুলোই নয়, হ্যারি ও ক্লারিসার কস্টিউম ইত্যাদিও। হোটেলের কাছের আর্সেনাল বেসিন মার্কেট থেকে মাত্র দশ মিনিটে কেনাকাটা সেরেছে লোকটা। কিছু গার্মেন্টিস চাচার দোকান থেকে, বাকি সব এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দোকান থেকে।

রুমের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল করিম, আরব বেশে ওকে চমৎকার মানিয়েছে দেখে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে নীরবে

হাসল। 'ফাদাল, এফেন্দি, ফাদাল। খেয়াল করে না তাকালে আপনার বন্ধুরাও চিনতে পারবে কি না সন্দেহ আছে।'

এবার বাকি কাজে হাত লাগাল লোকটা। লাল ও সাদা রং দিয়ে পেইন্ট করে দিল ওর মুখ। কাজ শেষ হতে মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। 'হ্যাঁ, এবার হয়েছে।'

এই সময় দ্রুত টোকা পড়ল বন্ধ দরজায়। হ্যারির অধৈর্য গলা শোনা গেল। 'কই, সাজগোজ হলো তোমার?'

'এসো!' হাঁক ছাড়ল রানা। 'হয়ে গেছে।'

ভেতরে পা রেখে থমকে গেল হ্যারি বেলভিল। একটু একটু করে বিস্ফারিত হয়ে উঠল দু'চোখ। 'গুড গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'ইউ ডু লূক আ গাই!'

'খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে?' হাসল রানা।

'নিশ্চই!' মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'গড্ ইন হেভেন! জানা না থাকলে চিনতেই পারতাম না তোমাকে।'

'এই মাত্র করিমও তাই বলছিল। পার্টি শুরু হচ্ছে ক'টায়?'

'সাড়ে দশটায়।'

করিমের দিকে ফিরল রানা। 'ওর সঙ্গে যাও, খুব ভাল করে পেইন্ট করতে হবে।'

মাথা দুলিয়ে হ্যারিকে অনুসরণ করল নিগ্রো।

ঠিক সাড়ে দশটায় হোটেল থেকে বের হলো ওরা। হ্যারি পরেছে ক্লাউনের কস্টিউম, লাল ও সাদা রং দিয়ে মুখটা সুন্দর করে পেইন্ট করে দিয়েছে করিম, ওকেও এখন চেনার কোন উপায় নেই। ক্লারিসা পরেছে খাটো স্কার্ট ও ডেকলিট অভ কলাম্বাইন। মুখে মুখোশও পরেছে। ছটফটে স্বভাবের কিশোরীর মত লাগছে ওকে দেখতে।

হোটেলের কার রেন্টাল সার্ভিস থেকে রানার ভাড়া করা

শানদার রোলস রয়েছে চড়ে দশ মিনিটে কটন ম্যাগনেট ম্যাকফারসনের শহরতলির বাড়িতে পৌঁছল ওরা। এই গাড়ি ভাড়া করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে রানার। শুধু এটাই নয়, আরও একটা গাড়ি ভাড়া করেছে ও। ব্যবস্থা অনুযায়ী একটু পর রেন্টাল সার্ভিসের ড্রাইভার এ বাড়ির বিশাল পার্কে রেখে যাবে ওটা।

রানাই চালাচ্ছিল গাড়ি, অজস্র গাড়ির ভিড়ে সুবিধেমত জায়গা দেখে পার্ক করল ও। হ্যারি-ক্লারিসার উদ্দেশে বলল, 'ভেতরে গিয়ে আলাদা হয়ে যাবে দুজনে, এক জায়গায় থাকবে না। যেখানে যত জটলা দেখবে, সবগুলোর কাছ দিয়ে ঘোরাঘুরি করবে, চোখ-কান খোলা রাখবে।'

জেটিতে শের খান ও হাবিব বে প্রিন্সেস, ফিলিপ এবং 'মাল' পৌঁছে দেয়া সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছিল, ভেবেচিন্তে সেসবের নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে রানা, সেটাও অল্প কথায় ওদের বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'চেষ্টা করবে ফিলিপ বয়েল পার্টিতে এসেছে কি না জানতে। এলে তাকে সনাক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। আমি তোমাদের কাছেপিঠে থাকব।'

নেমে পড়ল ওরা। গাড়ি লক্ করে সামনে তাকাল রানা। ম্যাকফারসনের বাড়িটাকে বাড়ি না বলে রাজপ্রাসাদ বলাই ভাল হবে। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। একেবারে গিজগিজ করছে রংচঙে কস্টিউম পরা নারী-পুরুষে! এত মানুষ, প্রথম দর্শনে মনে হবে শহরের কাউকেই আমন্ত্রণ জানাতে বাকি রাখেনি মানুষটা।

মার্বেল পাথরের হলরুমটা প্রকাণ্ড। সিলিং কম করেও একশো ফুট উঁচুতে। ইয়া চওড়া, চকচকে টাইলস্ মোড়া সিঁড়ি উঠে গেছে তার একপাশ দিয়ে। চারতলা সমান উঁচুতে কারুকাজ করা কাঠের রেলিং ঘেরা প্রশস্ত ঝুলবারান্দা, তার ওপাশে বড় বড়

রাজকীয় রূম।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগোল ওরা। চারদিক থেকে নানান ভাষা কানে আসছে। ইংরেজি তো আছেই, গ্রীক, আরবী, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, হিব্রুসহ আরও অনেক ভাষায় কথা বলছে মানুষ। প্রত্যেকে অদ্ভুত সাজে রয়েছে। কে কোন্ দেশী বোঝার উপায় নেই, ভাষা শুনলে বোঝা যায়। ফরসা, তামাটে, কালো, নানা রঙের সুন্দরী আছে। বাতাসে ভাসছে তাদের সেন্টের মিলিত গন্ধ। কুচকুচে কালো চুলের মিশরীয় অভিজাত পরিবারের সুন্দরীও আছে প্রচুর।

তাদের বড় বড় হরিণ চোখ দেখলে রক্তে বান ডাকে। এরা ভাল নাচতে জানে না, উল্টোপাল্টা পা ফেলে। তবে সিগারেটে টান দিতে জানে ভাল, সেই সাথে দৃষ্টিবাণ হানতেও সমান পারঙ্গম।

একটু দূর থেকে এরকম এক যুবতীর ওপর চোখ পড়ল রানার। বয়স্ক, মধ্য বয়স্ক মিশরীয় কর্মকর্তারা সেধে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটির সাথে আলাপ করতে, তাদের প্রত্যেকের আচরণে সমীহের ভাব।

ক্লিওপেট্রা সেজেছে মেয়েটি। চুলের সাথে জড়ানো আছে সোনার ফিলেট, রাজকীয় সাপ ও উড়ন্ত শকুনের প্রতীক আছে তার সাথে। কুচকুচে কালো, ঘন চুল মাথার ওপর চুড়ো খোঁপায় বাঁধা। সুডৌল, ফরসা ঘাড় উন্মুক্ত। গায়ের চামড়ার রং সোনালী তামার মত। দেহের তুলনায় মুখটা সামান্য বড়, ঠোঁট যেন একজোড়া কমলার কোয়া। চোখ বড়, রং হালকা নীল।

মেয়েটির চলন-বলন, চাউনি, সবকিছুতেই একটা আলাদা আভিজাত্য। আরও যেন কি একটা আছে, কিন্তু রানা ধরতে পারল না।

ম্যাকফারসনের সাথে ওকে বন্ধু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল হ্যারি বেলভিল। খুশি হলো কটন ম্যাগনেট, দু'চারটে বাক্য বিনিময় করল ওদের সাথে, ক্লারিসার কস্টিউম নিয়ে একটু রসিকতা করল, তারপর নতুন একদল গেস্ট এসে পড়ায় ক্ষমা চেয়ে সেদিকে এগোল দ্রুত পায়ে। মিনিট পাঁচেক নাচল বেলভিল দম্পতি, তারপর সবাই ছড়িয়ে পড়ল।

রাত দেড়টায় সাপার খেতে বসল সাড়ে ছয়শো আমন্ত্রিত অতিথি, এবং প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য সহায় হলো রানার। একটু আগে দেখা সেই অভিজাত সুন্দরীকে নিয়ে হলরুমে ঢুকল হাবিব ইসমাইল বে।

এতক্ষণ ঘোরাঘুরির ফল ও পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনার জন্যে এক টেবিলে বসেছিল রানা, হ্যারি ও ক্লারিসা। রানার পিছনের টেবিলে বসল ওরা, কয়েক ফুট দূরে। চাপা গলায় সঙ্গীদের কথা বলতে নিষেধ করে কান পাতল ও। খাচ্ছে অল্প, হাত নড়ছে বেশি। কথা ক্লিওপেট্রাই বলছে বেশি, তবে কাজের কিছু নয়। বে থেকে থেকে মাথা দোলাচ্ছে, হাসছে। সামনের দেয়ালে প্রকাণ্ড এক আয়না ঝুলছে, তার মধ্যে দিয়ে ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা। আরবীতে কথা বলছে ওরা। রানার মনে হলো ক্লিওপেট্রাই সম্ভবত প্রিন্সেস শায়লা।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, অথচ এখনও পর্যন্ত মেয়েটা বা হাবিব বে-র মুখ থেকে একটাও কাজের কথা বের হলো না দেখে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে ও, এই সময় নতুন মোড় নিল পরিস্থিতি। হলরুমের প্রকাণ্ড দরজায় রানারই মত দীর্ঘদেহী এক যুবক এসে দাঁড়াতে হাসি ফুটল হাবিব বে-র মুখে। রেড ইন্ডিয়ান চীফের কস্টিউম পরে আছে যুবক।

'ওই যে!' বে-র উত্তেজিত, চাপা কণ্ঠ শুনে কান খাড়া করল

রানা, নজর আয়নায় সেঁটে আছে। 'ওই সেই লোক, ফিলিপ। দেখতে পাচ্ছ?'

অলস ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ক্লিওপেট্রা। 'পাচ্ছি।'

'জিনিসটা নিতে ও যাবে তোমার কাছে। ওইসব হাবিজাবি ভাল ট্রানস্লেট করতে পারে লোকটা।'

রানাও তাকাল যুবকের দিকে, তবে সরাসরি নয়, আয়নার মধ্যে দিয়ে। ভাল করে দেখে চেহারাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিল। হ্যারি ও ক্লারিসা আরবী না জানলেও রানার সতর্ক ভাব দেখে কিছু একটা সন্দেহ করে বসেছে। অজানা উত্তেজনায় চক্‌চক্‌ করছে হ্যারির পেইন্ট-করা মুখ। রানার চোখে নীরব শাসানি দেখে সতর্ক হলো সে।

একটুপর দরজা থেকে সরে গেল ফিলিপ, ক্লিওপেট্রা ও হাবিবের আলোচনা মোড় নিল অন্যদিকে। এইবার খাওয়ার ঘাটতি পুষিয়ে নিল রানা। দুটোর দিকে নেপোলিয়নের কস্টিউম-টুপি পরা এক বিশালদেহী এগিয়ে এসে ক্লিওপেট্রাকে তার সাথে নাচার আহ্বান জানাতে হাসিমুখে উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু হাবিব বাধা দিল।

'প্যালেসে কখন ফিরছ তুমি?' প্রশ্ন করল সে।

শ্রাগ করল যুবতী, হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল, 'সবে দুটো বাজে। এখনই কি?'

চুক্‌ করে বিরক্তি প্রকাশ করল বেঁটে। 'ওকে তাহলে কখন যেতে বলব, সাড়ে চারটায়?'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল ক্লিওপেট্রা। 'আসুক সাড়ে চারটায়।'

'হোটেলে ফেরার পথে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবে ও,' দ্রুত বলল হাবিব বে। 'এর বেশি দেরি না হওয়াই ভাল।'

সম্মতি জানিয়ে নাচতে চলে গেল যুবতী, একটু পর বেঁটেও

আসন ছাড়ল, কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল সাপার-রূম থেকে। সতর্কতার সাথে লোকটাকে অনুসরণ করল রানা, হলরূমের ভিড়ের মধ্যে ফিলিপের সাথে কথা বলতে দেখল তাকে। কথা শেষ করে দু'জন দু'দিকে চলে যেতে টেবিলে ফিরে এল ও।

হ্যারির উদ্দেশে বলল, 'বুঝতে পারছি ক্লিওপেট্রাই আমাদের প্রিন্সেস, তবু একটু শিওর হয়ে নেয়া ভাল। সেই সাথে ওর প্যালেস কোথায়, সেটাও জানা দরকার। তুমি ম্যাকফারসনের সাথে কথা বলে খবর দুটো বের করো। আর তুমি, ক্লারিসা, ফিলিপকে ফলো করো দূর থেকে। সময়মত আমি আসব।'

রানার পরিকল্পনা ওরা জানে, কাজেই কেউ কোন প্রশ্ন না করে উঠে চলে গেল। রানা বেরিয়ে এসে চেক করে দেখল দ্বিতীয় গাড়িটা এসেছে কি না—এসেছে। রেখে চলে গেছে ড্রাইভার। চাবি ঝুলছে ইগনিশনে। সময় কাটাতে সামনের লনে সিগারেট ধরিয়ে কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করল রানা, তিনটের দিকে ফিরে এল বাড়ির ভেতর।

ওর অপেক্ষাতেই ছিল হ্যারি বেলভিল, দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এল। 'ও-ই শায়লা, রানা। ওর প্যালেস রু সুলতান হুসেইনের পার্ক লেনে। পনেরো বিশ মিনিটের পথ।'

'গুড!'

'আরও শোনো, একুশ বছর বয়স এখন শায়লার, দু'বছর আগে বিধবা হয়েছে। বর্তমানে ঝাড়া হাত-পা। অকল্পনীয় টাকা-পয়সা, জমাজমির মালিক মেয়েটা। মা ছিল পারসিয়ান, বাবা এদেশী। দূর-প্রাচ্যের সাথে অনেক ব্যবসা…' রানাকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতে দেখে থেমে গেল সে, হেসে উঠল।

'তোমাকে শুধু ওর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বলেছি

আমি, ওর গুষ্টির পরিচিতি নয়,' রানা বলল।

আবার হাসল হ্যারি। 'ম্যাকফারসনের কাছে আমিও সেটাই জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাটা চান্স পেয়ে···যাক্গে,' হাতঘড়ি দেখল। 'কখন যাচ্ছি আমরা?'

'চারটার দিকে।'

একটু পর ভিড়ের মধ্যে ক্লারিসাকে দেখা গেল, এদিকেই আসছে। কাছে আসতে ফিলিপের খবর জানতে চাইল রানা। 'ও রূফ গার্ডেনে আছে,' বলতে গিয়ে কান-গাল লাল হয়ে উঠল মেয়েটির। কিন্তু রানা খেয়াল করল না।

'ওখানে কি করছে?'

এবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল ও। 'দেখতে যাইনি। এক সুন্দরী ডাচ আছে ওর সাথে।'

'ও!' সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রানা। চারটের একটু আগে ফিলিপকে পালকের হেড-ড্রেস ঠিক করতে করতে নেমে আসতে দেখে রোলসের চাবি হ্যারির দিকে এগিয়ে দিল। 'জলদি যাও, গাড়িটা ফ্রন্ট ডোরের সামনে রেখে সরে পড়ো। ক্লারিসাও যাও।'

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর এগিয়ে চলল হলরুমের দিকে। বয়স্ক এক ইংরেজের সাথে কথা বলছিল ফিলিপ, সোজা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সসম্মানে বো করে বলল, 'মাফ করবেন, স্যার। আপনি মিস্টার ফিলিপ বয়েল, রাইট?'

'হ্যাঁ, আমিই ফিলিপ,' একটু বিস্মিত দেখাল তাকে, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে।

'প্রিন্সেস শায়লা আপনাকে নিয়ে যেতে গাড়ি পাঠিয়েছেন, স্যার।'

'প্রিন্সেস গাড়ি পাঠিয়েছেন?'

আবার বো করল ও। 'ইয়েস, স্যার। আমার সাথে আসুন।' একদিকে সামান্য একটু সরে, ঝুঁকে বাঁ হাতে পথ দেখানোর ভঙ্গি করল।

'আচ্ছা, চলুন।' বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সে, খুব সম্ভব ম্যাকফারসনের খোঁজে। কিন্তু লোকটাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে মুখ দিয়ে 'চুক্' করে বিরক্তি প্রকাশ করল। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে রানার দিকে ফিরল। 'চলুন।'

ক্লোক রূম থেকে হালকা রঙের একটা কোট পরে নিল সে বেরোবার সময়। বাইরে এসে সামনেই দাঁড়ানো ঝকঝকে পালিশ করা একটা রোলস রয়েস দেখে নিচু সুরে শিস বাজাল। পিছনের দরজা মেলে ধরে আরেকবার বো করল রানা। 'আসুন।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর নিঃশব্দে গড়াতে শুরু করল ভারী গাড়িটা। ড্রাইভিং সীটে বসার আগে আড়চোখে পিছনটা দেখে নিয়েছে রানা, হ্যারি ও ক্লারিসাকে দেখল উঠে পড়েছে দ্বিতীয় গাড়িতে। মনে মনে হাসল ও, বড় রাস্তায় উঠে গিয়ার শিফট করে তুফান বেগে রোলস ছোটাল।

একটানা দশ মিনিট চলার পর রিয়ার ভিউ মিররে ফিলিপকে ঘন ঘন বাইরে তাকাতে দেখে বোঝা গেল কিছু সন্দেহ করেছে লোকটা। অন্তত করতে শুরু করেছে। মিনিটখানেকের মধ্যে তার উসখুসানি আরও বাড়ল।

'অ্যাই! কোথায় যাচ্ছি আমরা?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে।

'প্রিন্সেস শায়লার বাড়িতে, এফেন্দি!'

কয়েক মিনিটের জন্যে আশ্বস্ত হলো ফিলিপ বয়েল, তারপর আবার নড়েচড়ে উঠল। ততক্ষণে শায়লার বাড়ির পথ অনেক

পিছনে ফেলে এসেছে রানা। রামলের ভেতর দিয়ে ছোটাচ্ছে রোলস। পথের দুদিকে স্থানীয় ইংলিশ কলোনি, প্রচুর বাড়িঘর। কিন্তু অসময় বলে একটা বেড়ালও নেই রাস্তায়। খানিক পর ফের চেঁচাতে শুরু করল ফিলিপ, কিন্তু রানা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। কারণ দুই সীটের মাঝের কাঁচের পার্টিশন আগেই তুলে দিয়েছে ও, লক্ করে দিয়েছে সব দরজা। গলা ফাটানো ছাড়া কিচ্ছু করার নেই এখন ফিলিপ বয়েলের।

কিছুক্ষণ পর গতি খানিকটা কমিয়ে ভিউ মিররে নজর রাখল রানা, পিছনের গাড়িটাকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিল। আরও কিছুদূর এগিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখে থামল। দু'দিকে খোলা মাঠ ছাড়া কিছু নেই এখানে। ওরটার দেখাদেখি পিছনেরটাও থেমে পড়ল কয়েক গজ পিছনে, হ্যারি ও ক্লারিসা নেমে পড়ল। ডোর আনলক্ করে রানাও নামল, এক ঝট্‌কায় পিছনের একটা দরজা খুলে ফেলল। হাতে চকচক করছে ওয়ালথার।

'এসবের অর্থ কি?' হুঙ্কার ছাড়ল ফিলিপ। 'যদি ডাকাতি করার উদ্দেশে আমাকে ধরে এনে থাকো, তাহলে বলব ভুল করেছ তোমরা।'

হাসল রানা। 'ডাকাতিই করব, তবে তোমার টাকা-পয়সা নয়।'

'তাহলে?'

'তোমার কস্টিউমটা কিছুক্ষণের জন্যে চাই আমার। খোলো ওটা।'

'হোয়াট!' বিস্ফোরিত হলো যুবক। 'কস্টিউম...!'

অস্ত্র তুলল রানা। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নিজে খুলবে, না আমি খুলে নেয়ার ব্যবস্থা করব?'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ফিলিপ। 'এসব...এসব দিয়ে

কি করবে? কে তুমি? প্রিন্সেস শায়লার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে এখানে...' রানার চাউনি শীতল হয়ে উঠতে দেখে থেমে ঢোক গিলল সে। অসহায় চোখে হ্যারি-ক্লারিসার দিকে তাকাল।

ওয়ালথারের নল তার কপাল বরাবর তুলল রানা। শান্ত গলায় বলল, 'তুমি নিজে খুলবে, নাকি আমাকে খুলে নিতে হবে?'

আর কথা বাড়াতে সাহস হলো না যুবকের, দ্রুত কস্টিউম খুলতে শুরু করল। আন্ডারগার্মেন্টস ও জুতো ছাড়া আর সব খুলে কোটটা কোলের ওপর বিছিয়ে বসে থাকল মুখ গোমড়া করে। নিজেরগুলো খুলে ব্যস্ত হাতে সে সব পরে নিল রানা, লুকিং গ্লাসে চেহারা দেখে নিল।

মুখে রঙের আঁকিবুকি ফিলিপের সাথে মেলে না, তবে ওতে কোন সমস্যা হবে না। চলবে। দূর থেকে তাকে সামান্য ক্ষণের জন্যে দেখেছে শায়লা, অতকিছু নিশ্চয়ই খেয়াল করেনি। এখন সময়মত তার বাড়িতে পৌঁছতে পারলে হয়। ঘড়ি দেখে হ্যারির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি চললাম। কড়া নজর রেখো এর ওপর। তেড়িবেড়ি দেখলে শেষ করে দেবে।'

ফুল স্পীডে গাড়ি ছুটিয়েও পৌঁছতে দেরি করে ফেলল ও। চারটা চল্লিশে প্রিন্সেসের প্যালেসের ডোর-বেল বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। ঐতিহ্যবাহী তুর্কী পোশাক পরা এক যুবক খুলল।

'আমি ফিলিপ বয়েল,' বলল ও। 'প্রিন্সেস আমাকে আশা করছেন।'

'আসুন, এফেন্দি,' বো করল যুবক। 'হার হাইনেস ওপরতলায় আছেন।'

তাকে অনুসরণ করল রানা। হাঁটছে না যুবক, মনে হলো নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে। প্রশস্ত করিডরের দু'দিকের দুই

বিলাসবহুল রিসেপশন হল পার হয়ে এল ওরা। হাঁটার ওপর ভেতরে চোখ বুলিয়ে নিল রানা। দুটোই প্রায় একরকম দেখতে—মেঝেতে হালকা রঙের নরম পারশিয়ান কার্পেট, তার ওপর দামী ফার্নিচার। হাতির দাঁত, পেতল, ব্রোঞ্জ, এনামেল ইত্যাদির সূক্ষ্ম কারুকাজ করা।

এরপর বড় এক হলরুম। তার এক মাথায় মার্বেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি। যুবকের পিছন পিছন ওপরতলায় উঠে এল রানা, দুটো বড় রুম অতিক্রম করে তৃতীয়টার সামনে থামল তার দেখাদেখি। রুমের দরজা খোলা, টকটকে লাল রঙের ভারী পর্দা ঝুলছে। ফিলিপ বয়েলের আগমন ঘোষণা করল তুর্কী, পরক্ষণে ভেতরে যাওয়ার আহ্বান ভেসে এল।

ঢুকল রানা। দরজা বরাবর ও-মাথার দেয়ালঘেঁষা এক ডিভানে শুয়ে আছে প্রিন্সেস। বুকের পাশে বালিশ দিয়ে কাত হয়ে এক হাতের ওপর মাথা রেখে সুগন্ধী সিগারেটে চুমুক দিচ্ছে। এ ঘরের মেঝেতেও একই রঙের কার্পেট, বেশ পুরু, গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায় প্রায়। ক্লিওপেট্রার বেশ বদলে ফেলেছে প্রিন্সেস, এ মুহূর্তে স্লীভলেস টার্কিশ জ্যাকেট ও পাতলা, সাদা কাপড়ের ট্রাউজার্স পরে আছে। ওটা এতই পাতলা যে পা, উরু, সব দেখা যায়। ডিভানের কাছে একটু নিচু, পুরু গদিমোড়া টুল আছে, ওটা ছাড়া বসার আর কিছু নেই এ ঘরে।

পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার মৃদু শব্দ উঠতে ঘুরে তাকাল রানা। বাইরে থেকে ভিড়িয়ে দিয়েছে নর্তক। প্রিন্সেস একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে অস্বস্তি লেগে উঠল। এত মন দিয়ে কি দেখছে মেয়েটা? ওকে সন্দেহ করেনি তো?

মন অন্য কাজে ব্যস্ত রাখার জন্যে ঘরের চারদিকে নজর বোলাল ও। বাঁ দিকে অর্ধেক কাঠ ও অর্ধেক সোনার তৈরি

কারুকাজ করা বড় এক লিকার কেবিনেট আছে, ভেতরে হরেক রঙের পানীয়। তার ওপর ছোট্ট রুপোর ট্রাইপডে জ্বলছে পারফিউম বার্নার, সুগন্ধে ভরিয়ে রেখেছে ঘর। তিন দেয়ালে ঝুলছে দামী অয়েল পেইন্টিং, এক দেয়ালে অন্য জিনিস।

প্রাচীন আমলের নানান অস্ত্রশস্ত্র। দেয়াল প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ওগুলোর তলায়। বেশিরভাগই মুরিশ ধাঁচের, হাতলে সোনা ও হাতির দাঁতের কাজ করা। প্রিন্সেসের হবি অবাক করল ওকে।

'দেরি করে ফেলেছেন আপনি,' হঠাৎ বলে উঠল শায়লা, একেবারে চোস্ত ফ্রেঞ্চ ভাষায়।

'দুঃখিত, প্রিন্সেস,' মনে মনে হাঁপ ছেড়ে ও-ও ফ্রেঞ্চে বলল। 'একটা সমস্যায় পড়ে ...'

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন আমাকে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল সে।

'সত্যি দুঃখিত। জিনিসটা দিয়ে দিলে এক্ষুণি বিদেয় নেব আমি। আপনিও শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবেন, আমিও...'

আবার বাধা দিল প্রিন্সেস। 'অভদ্রতাও আমার অপছন্দ।'

'অভদ্রতা!'

'নিশ্চয়ই!' একটু উঁচু হলো সে। 'এদেশের রীতি অনুযায়ী, দু'জনের পরিচয় পর্ব শেষ না হতেই যদি একজন চলে যেতে চায়, সেটা অভদ্রতা।'

'প্রিন্সেস, ভুল বুঝেছেন আপনি,' দু'পা এগোল ও। 'এখনই আপনার সঙ্গ ছেড়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। আপনি টায়ার্ড ভেবে বলেছি কথাটা।'

আবার কিছুক্ষণ ওকে দেখল প্রিন্সেস। লোভনীয় ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটি ফুটি করেও ফুটল না। 'বসুন,' টুলটা দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'সামনের টেবিলে সিগারেট আছে. ইচ্ছে হলে খেতে

পারেন।'

বসল ও। সামনের টেবিলে রাখা প্রিন্সেসের দামী সিগারেট কেসটা দেখে মাথা ঝাঁকাল। 'ধন্যবাদ, সেই সন্ধে থেকে অনেক হয়েছে, আর না। আপনার এত কাছে আসার সুযোগ পেয়েই আমি খুশি।'

চোখের তারায় মৃদু ঝিলিক খেলে গেল প্রিন্সেসের। 'রিয়েলি?'

'নিশ্চই!' জোর দিয়ে বলল রানা। 'নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমার। অনেকের মুখেই আপনার রূপের প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু সামনাসামনি আপনাকে দেখে বুঝলাম, ওরা একজনও সত্যিকারের রূপসী মেয়ের রূপের বর্ণনা কাকে বলে, তাই জানে না।'

এক ভুরু উঁচু হলো প্রিন্সেসের। 'অর্থাৎ? ওরা যেমন বলে, আমি তেমন নই?'

'মোটেই না। আপনি তার চেয়েও হাজারগুণ... কি বলব, সুন্দরী। এমন সুন্দরী জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি।'

চেহারা ঝলমল করে উঠল মেয়েটির। 'সুন্দরীদের প্রতি আপনার দুর্বলতা বেশি মনে হচ্ছে!'

শ্রাগ করল ও। 'আমি এক যুবক, প্রিন্সেস। দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক।'

মৃদু শব্দ করে হাসল মেয়েটি। 'তাহলে আমাদের বন্ধু হাবিব বে-র হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে গেলে কি অবস্থা হবে আপনার, কে জানে!'

'হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস?' ঝুঁকে বসল রানা। 'সেটা কি?'

'হাবিবের সংগ্রহ করা ডানাকাটা পরীদের আখড়া।'

বোকা বোকা চেহারা হলো ওর। 'বুঝলাম না।'

'বড় বড় সরকারী অফিসারদের হাতে রাখার জন্যে এশিয়ার

নানান দেশ থেকে বাছাই করা সুন্দরী, অল্পবয়সী মেয়ে এনে ওখানে রাখে হাবিব বে। ওরা সবাই একেকটা ডানাকাটা পরী, দেখলে মাথা ঘুরে যাবে আপনার।'

'সেটা কোথায়, কায়রোয়?' বলল ও।

'ইসমাইলিয়ায়। হাবিবের বন্ধুরা সুযোগ পেলেই ওখানে যায় স্বাদ বদল করতে।'

'তারপর?'

'তারপর?' মাথা ঝাঁকাল প্রিন্সেস। 'তারপর একদিন বাসী হয়ে গেলে ওদের ইওরোপে অথবা মেডিটারেনিয়ানের কোন বন্দরে বেচে দেয় হাবিব, নতুন মেয়ে জোগাড় করে আনে।'

তথ্যটা মাথায় টুকে রাখল রানা। একটু সময় চিন্তার ভান করে মাথা দোলাল। 'সে ওরা যত সুন্দরীই হোক, আপনার মত কেউ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি অনেকটা... অনেকটা...' ইচ্ছে করে থেমে গেল ও।

'অনেকটা কি?'

'স্বপ্নের মত...অনেক সাধনার ধনের মত।'

আবার এক ভুরু তুলে ওকে দেখল প্রিন্সেস, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। 'এই সাধারণ ড্রেসে?'

হ্যাঁ সূচক মাথা দোলাল রানা।

এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটা। রূপের এত প্রশংসায় মজে গেছে। 'তুমি নিজেও কম আকর্ষণীয় নও, লাভলি বয়,' সম্বোধন পাল্টে গেল তার। 'কতটা লাভলি, আগামীবার সাক্ষাতে বোঝা যাবে।'

'কবে দেখা হবে আবার,' যেন পরোক্ষ আমন্ত্রণ পেয়ে যার-পর নেই অস্থির হয়ে উঠেছে, এমন ভঙ্গিতে বলল ও। 'আগামীকাল?'

মুহূর্তে চেহারা বদলে গেল প্রিন্সেসের। 'কাল! কাল তিনটের

ট্রেনে না কায়রো যাচ্ছ তোমরা?'

একটা ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো রানা। যেন মনে ছিল না, এমনভাবে বলল, 'ও হ্যাঁ, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম,' বোকাটে হাসি দিল। 'আসলে সব দোষ তোমার রূপের।'

আবার চেহারা কোমল হয়ে উঠল প্রিন্সেসের। হাসল শব্দ করে—বুক ঠেলে উঠে আসা হাসি। 'বোসো, জিনিসটা নিয়ে আসি।'

মোহনীয় ভঙ্গিতে উঠে বসল প্রিন্সেস, নিতম্বে ঢেউ তুলে পাশের রুমে চলে গেল। ফিরল পাঁচ মিনিট পর, দু'হাতে ধরা হেরু-টেমের ফলক। এ মুহূর্তে পুরু, বাদামী কাগজে মোড়া। ওটা রানার হাতে তুলে দিল সে। 'গুড বাই! আবার দেখা হবে।'

আচমকা বিষয়টার ইতি ঘটতে খুশি হলেও চেহারায় হতাশা ফুটিয়ে তুলল রানা। 'আবার তাহলে কবে দেখা হচ্ছে আমাদের?'

'কাজ সেরে ভালয় ভালয় ফিরে এসো, তারপর। গুড বাই।'

'গুড বাই।' প্রিন্সেস দরজা মেলে ধরতে বেরিয়ে এল ও, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল দ্রুত। নিচ থেকে চাপা কোলাহলের শব্দ কানে আসতে আরও জোরে হাঁটতে লাগল, বুঝে ফেলেছে কোথাও কোন গণ্ডগোল ঘটেছে। সবে অর্ধেক সিঁড়ি নেমেছে ও, এই সময় সামনের দরজা খুলে গেল দড়াম করে। সেখানে উত্তেজিত, আধা ন্যাংটো ফিলিপকে দেখতে পেয়ে আত্মা উড়ে গেল।

'ওই তো সেই লোক!' ওকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল সে। 'ও ভুয়া, ফিলিপ নয়! আমি ফিলিপ। ধরো ওকে, পালাতে পারে না যেন!'

আঁতকে উঠে পিছনে ফিরল ও, দেখল সিঁড়ির গোড়ায় প্রিন্সেস দাঁড়িয়ে। হাতে পিস্তল। সর্বনাশ! নিশ্চয়ই নিচের কোলাহল শুনে কৌতূহলী হয়ে কি ঘটছে দেখতে এসেছে মেয়েটা। যদি ওর কিছু

সন্দেহ হয় ফিলিপের কথায়, তাহলে সর্বনাশ! দৌড় দেবে কি না ভাবছে রানা, এই সময় ক্লারিসা দেখা দিল দরজায়। তখনই আবার ধমকে উঠল প্রিন্সেস, 'এসব কি হচ্ছে? লোকটা কে?'

'এক হদ্দ মাতাল, প্রিন্সেস!' চেঁচিয়ে বলল ক্লারিসা। 'গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে পথে পড়ে ছিল দেখে আমরা আমাদের গাড়িতে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই পর্যন্ত এসে আমার স্বামীকে গাড়ি থামাতে বাধ্য করে লোকটা,' ইঙ্গিতে পিছনে দাঁড়ানো হ্যারিকে দেখাল। 'বলে, এটা নাকি ওর লাভারের বাড়ি। আপনি ওর প্রেমিকা।'

ভুরু কুঁচকে উঠল শায়লার, কিন্তু সে কিছু বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই ফিলিপ পা বাড়াল, সেই তুর্কী ড্রেস পরা যুবককে ঠেলে উঠে পড়ল সিঁড়িতে।

'মিথ্যে কথা, প্রিন্সেস!' গর্জে উঠল সে। 'মেয়েটা মিথ্যে বলছে। আমি মোটেও মাতাল নই, বরং এই লোকটা...' বলতে বলতে আরও কয়েক পা উঠল। 'এই লোকটা আমাকে ম্যাকফারসনের পার্টি থেকে মিথ্যে কথা বলে...'

আর এগোবার সুযোগ পেল না সে, নাগালের মধ্যে উঠে আসতে তার দুই পায়ের ফাঁকে মাঝারি ওজনের এক লাথি ঝেড়ে বসল রানা। 'হুঁক্!' করে উঠে কুঁকড়ে গেল ফিলিপ, লাফ দিল রানা এই সুযোগে। পরের কয়েক ধাপ চোখের পলকে উড়ে পেরিয়ে এল। হলরুমের ফ্লোরে পা রাখামাত্র ছুটে এল নাচনেওয়ালা যুবক। বাউলি কেটে সরে গেল রানা, ওর আর প্রিন্সেসের মাঝখানে নিয়ে এল তাকে।

এখন প্রিন্সেস গুলি করতে চাইলেও পারবে না যুবকের গায়ে লেগে যাওয়ার ভয়ে। ওয়ালথার তুলে তার বুক সই করে ধরল রানা। চোখ পাকিয়ে বলল, 'খবরদার! এক পাও-ও এগোবে না।'

পিছাতে শুরু করল ও। দেখল ও যা ভেবেছে, তাই ঘটেছে। পিস্তল তুলেও শেষ পর্যন্ত নামিয়ে নিয়েছে প্রিন্সেস।

'ওকে ধরো!' ফিলিপ কোনমতে বলল। 'যেতে দিয়ো না।'

ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। শেষবারের মত প্রিন্সেসের সাথে চোখাচোখি হতে বলল, 'আমি সামনের দরজা টেনে লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, প্রিন্সেস। কেউ যদি তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বের হয় সে তার নিজ দায়িত্বে বের হবে।'

কেউ বের হচ্ছে কি না, দেখার অপেক্ষায় থাকল না ওরা। ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে স্টার্ট নিল দুটো গাড়ি, দেখতে দেখতে হাওয়া হয়ে গেল।

ছয়

হোটেলের কাছে ফলকটা বগলে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মাসুদ রানা। হ্যারিকে ওর মার্সিডিজ ভেতরের কার পার্কে নিয়ে রাখতে বলে নিজে হেঁটে চলল পিছনের ফায়ার এস্কেপ সিঁড়ির দিকে। সবার চোখের সামনে দিয়ে জিনিসটা নিয়ে ঢুকতে চায় না। দ্বিতীয় গাড়ি ক্লারিসা চালিয়ে নিয়ে গেল।

দশ মিনিট পর নিরাপদে নিজের রুমে ঢুকল রানা, জিনিসটা বিছানার নিচে, মাথার দিকে রেখে ঘুরে দাঁড়াল। প্রায় একই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকল বেলভিল দম্পতি।

দরজা বন্ধ করে ওদের দেখল রানা। 'আরেকটু হলে বরবাদ

হয়ে যেত সব। ব্যাটা পালাল কি করে?'

লজ্জা পাওয়া চেহারা হলো হ্যারির। আমতা আমতা করে বলল, 'রং শুকিয়ে ভীষণ চড়চড় করছিল মুখ, খুব চুলকাচ্ছিল। তাই একটু···কিন্তু ও যে এত সেয়ানা, বুঝতে পারিনি। এক সেকেন্ডের সুযোগেই ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে। তারপর দে দৌড়। ওই সময় পরপর কয়েকটা গাড়ি এসে হাজির হলো বলে কিছু করতে পারিনি। পরে অবশ্য তাড়া করেছিলাম, কিন্তু ফিলিপ রাস্তা দিয়ে না এসে মাঠ দিয়ে কোনাকুনি এসেছে।

'পরে যখন বুঝলাম ওকে ধরা যাবে না, তখন ভাবলাম ওর থেকে এগিয়ে অপেক্ষা করি, সময়মত বাধা দেব। একটুর জন্য তা-ও হলো না।'

মাথা দোলাল রানা। ভাবল, ভুলটা ওরই। হ্যারির ওপর পুরো ভরসা করা ঠিক হয়নি। ওর উচিত ছিল লোকটাকে বেঁধে গাড়ির বুটে ফেলে রেখে আসা, কিন্তু তখন অত সময় ছিল না। শ্রাগ করল ও।

'যাক্‌গে, যা হওয়ার হয়েছে। জিনিস যে ফিরে পেয়েছি, তাই বেশি। তবে শেষ সময় তোমাদের বানানো গল্প যথেষ্ট সাহায্য করেছে আমাকে। সে জন্যে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু তোমারই বা বেরোতে এত দেরি হলো কেন বলো তো?' ক্লারিসা বলল। 'কী এত গল্প করলে এতক্ষণ ধরে?'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে না হেসে পারল না রানা। 'বিশেষ কিছু না। এই এটা-ওটা নিয়ে···'

'কথা লুকোচ্ছ মনে হয়?' সন্দেহ ফুটল মেয়েটির চেহারায়। 'কোথায় বসে গল্প করেছ তোমরা, আরও কেউ ছিল ওখানে?'

'না। আমি আর প্রিন্সেস।'

'বুঝেছি। নিশ্চই তোমরা···' কথা শেষ করল না ক্লারিসা, তবে

কি বলতে চাইছিল, তা বুঝতে কারও অসুবিধাও হলো না।

'পাগল নাকি!' রানা বলল। 'পরিচয় হতে না হতেই?'

'ওটা কোন ব্যাপার হলো নাকি? তাছাড়া যা একখানা কিলার মার্কা চেহারা তোমার, সুযোগ পেলে কোন মেয়ে ছেড়ে দেবে বলে আমার তো মনে হয় না।'

'মেয়ে তো তুমিও,' রানা বলল। 'প্রিন্সেসের জায়গায় তুমি হলে কি করতে?'

'আমি?' বলে হ্যারির দিকে তাকাল ক্লারিসা, চোখাচোখি হতে হাসল। 'সরি, এখন বলা যাবে না।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল রানা ও হ্যারি।

গোসল শেভ সেরে রুমে বসে ভরপেট নাস্তা খেয়ে নিল রানা। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে কফির কাপ টেনে নিল কাছে। শের খান ও হাবিব বে-র পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে ভাবছে।

চোরের ওপর বাটপাড়িটা কে করেছে, এতক্ষণে তা জানাজানি হয়ে গেছে। গতরাতে সরফরাজ ফিরে না আসায় নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছিল খান, ফিলিপের মুখে বাকি ঘটনা শুনে সেটা পোক্ত হবে। বুঝে নেবে মাসুদ রানা মরেনি, বরং উল্টোটা ঘটেছে। ও ফিরে এসে আবার ঘোঁট বেঁধেছে সিলভির বান্ধবী ও তার স্বামীর সাথে, এবং ওরা সবাই মিলে ছিনিয়ে নিয়েছে ফলকটা।

কাজেই এখন তারা চাইবে ওটা ফের কব্জা করতে। তবে এবার যে আগের মত সহজে কাজ সারা যাবে না, শের খান তা বোঝে। চুরি-চামারিতে কাজ হবে না, পাল্টা ছিনতাই করতে হবে। প্রয়োজনে প্রকাশ্যে। কিন্তু এত সাহস কি হবে তার?

ঠিক দশটায় করিম এল। রানা আসতে বলেছিল। ঠিক করে

রেখেছে, করিমের আপত্তি না থাকলে অভিযানে তাকেই গাইড হিসেবে সঙ্গে নেবে। অনুমান সঠিক প্রমাণ হলো ওর, প্রস্তাব শুনে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

'ভেবে বলো,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'কাল যা ঘটেছে, তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এটা কোন সাধারণ অভিযান নয়। সমস্যা দেখা দেবে, বাধা আসবে। হয়তো খুন-খারারিও ঘটবে দু'চারটা। তাই খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'তেমন কিছুর সম্ভাবনা থাকলে তো অবশ্যই যাব আমি, এফেন্দি,' সে-ও গম্ভীর জবাব দিল। 'ওসবের মধ্যে একা আপনাকে যেতে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

লোকটা আবেগের কথা বলছে দেখে বিরক্ত হলো রানা। 'আমি একা নই, করিম। সঙ্গে লোক আছে, প্রয়োজনমত আরও জোগাড় করে নিতে পারব। আর...'

'ওসব নিয়ে কিছু চিন্তা করবেন না আপনি,' বাধা দিল নিগ্রো। আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল সযত্নে। 'আপনার হয়ে সে কাজটাও আমি করে দেব। প্রচুর উপযুক্ত লোক আছে আমার হাতে।'

শ্রাগ করল ও, ফোনে হ্যারি ক্লারিসাকে ওর রুমে আসতে বলল। সবকিছু ফাইনাল করে রাখতে হবে। এরপর সিলভির প্রতীক্ষা। বারোটার ফ্লাইটে আসছে ও—বাবার লাশের ব্যবস্থা করতে। হ্যাম্পশায়ারের ফিরতি যাত্রায় লন্ডন ফিরে যাচ্ছে ওটা। অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানকার মর্গে থাকবে।

স্যার কার্টারের মৃত্যুর খবর শুনে সিলভির কি প্রতিক্রিয়া হবে জানত রানা, তাই ওকে ফোন করে সরাসরি জানায়নি কথাটা। সাহস হয়নি। জানিয়েছে কায়রো পুলিস চীফের মাধ্যমে। রাতেই রওনা হতে চেয়েছিল ও, কিন্তু লাশ নিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র তৈরি হতে সময় লেগেছে বলে পারেনি।

এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল রানা, এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। হ্যারি হবে মনে করে রিসিভার তুলল ও। 'ইয়েস!'

'রিসেপশন, স্যার। কায়রোর পুলিস চীফ কথা বলবেন।'

'পুলিস চীফ?' চোখ কুঁচকে উঠল ওর।

'রাইট, স্যার।

'থ্যাঙ্ক ইউ, দিন।'

'কুট্' করে শব্দ উঠল লাইনে, পরমুহূর্তে মোটা, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'রানা?'

'হ্যালো, পাশা!'

'হ্যাঁ। শোনো, মিস্ কার্টার কোথায়?'

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল ওর। 'মানে?'

'বলছি, সে কি আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছেছে?'

'নাহ্! ওর তো আজ বারোটায় পৌঁছার কাথা। কেন?'

'আমিও তাই জানতাম, কিন্তু...'

অজানা আশঙ্কায় বুক শুকিয়ে উঠল রানার। 'কি বলছ?'

'কাল মিস্ কার্টারকে বলেছিলাম আমিই তাকে সকালে এয়ারপোর্ট পৌঁছে দেব।'

রিসিভার কানের সঙ্গে ঠেসে ধরল ও। 'তো?'

'এইমাত্র ফিরেছি ওর ফ্ল্যাট থেকে। ওকে পাইনি। নেই মেয়েটা। অথচ ফ্ল্যাটের দরজা আন-লকড্।'

আশঙ্কাটাকে উড়িয়ে দেয়ার জন্যে মনের ওপর অসম্ভব জোর খাটিয়েও ব্যর্থ হলো রানা। ঘাম ছুটে গেল। কোনমতে বলল, 'আশপাশের কোন ফ্ল্যাটে, বা...'

'না, রানা। খুঁজে দেখেছি আমি। বাইরে কোথাও গেছে ভেবে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করেছি, আসেনি ও। সবচেয়ে বড় কথা,

ওর প্লেনের টিকেট তো আমি করিয়েছি। এখনও ওটা আমার পকেটে।'

শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে।

'রানা, লাইনে আছ তুমি?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ, আছি।'

'মেয়েটা কোথায় যেতে পারে বলো তো?' প্রশ্ন করল চিন্তিত পুলিস চীফ। 'এয়ারপোর্টে, রেল স্টেশনে খোঁজ নিয়েছি আমি, কোথাও দেখা যায়নি ওকে। এর অর্থ কি? ওর বাবার খুনের সাথে এর কোন যোগাযোগ নেই তো?'

'ইসমাইলিয়া!' হঠাৎ রানার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল শব্দটা।

'কি বললে?'

'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, স্যার কার্টারের খুনীরা ওকে ইসমাইলিয়ায় ধরে নিয়ে গেছে।'

'বুঝলে কি করে?' প্রশ্ন করল ইসমত পাশা।

'অনুমান,' রানা বলল গম্ভীর গলায়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে। 'ইসমাইলিয়ায় কেন? ওখানে কোথায়?'

'হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে।'

'সেটা কি?'

ওটা সম্পর্কে প্রিন্সেস শায়লার মুখে শোনা কাহিনী সংক্ষেপে বলে গেল রানা। শুনে অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে উঠল চীফ। 'হাবিব ইসমাইল বে তাহলে নারী ব্যবসার সাথেও জড়িত! ভাল। আর সব যেমন-তেমন, কিন্তু এই খবর আমাদের জন্যে নতুন, রানা। কিন্তু মিস্ কার্টারকে ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন ভাবছ তুমি। আর কোথাও...'

'পাশা!' বাধা দিল ও। 'বাড়িটা যে নারী ব্যবসার আখড়া, সে খবর ইসমাইলিয়া পুলিসের অজানা থাকার কথা নয়, অথচ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওখানকার চীফ ব্যাপারটা হাই লেভেলে জানায়নি। অর্থাৎ বাড়িটা ওদের নিরাপদ ঘাঁটি। তাছাড়া তুমি দেখেছ, সিলভি যথেষ্ট সুন্দরী। এখন হাবিব বে যদি আমের শোক ছালার ওপর দিয়ে উশুল করে, অথবা ওর মুক্তিপণ হিসেবে...'

'বুঝতে পেরেছি আমি,' ব্যস্ত হয়ে উঠল পুলিস। 'তুমি ঠিকই ধরেছ, রানা। মুশকিল! তাহলে?'

রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে রানার। কেন যে কাল এই আশঙ্কার কথা একবারও মাথায় এল না! পাশাকে সতর্ক করে দিলে সে নিশ্চয় পুলিস গার্ডের ব্যবস্থা করতে পারত সিলভির জন্যে, অথবা ওকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে রাখতে পারত।

কিন্তু এখন তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, নিজেকে বোঝাল রানা। তাতে সমস্যা বাড়বে ছাড়া কমবে না। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হবে, কি করে খুব তাড়াতাড়ি সিলভিকে উদ্ধার করা যায়, সেই পরিকল্পনা করতে হবে।

'রানা! লাইনে আছ তুমি?'

'হ্যাঁ। শোনো, পাশা, সিলভিকে উদ্ধার করতে এখন একটাই করণীয় আছে। হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে রেইড করতে হবে। ফুল স্কেল অ্যাসল্ট, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'কিন্তু, রানা, অফিশিয়ালি...'

'আমি জানি তা সম্ভব নয়। হাজার হোক, হাবিব বে ডিপ্লোম্যাট, এদিক-ওদিক কিছু হয়ে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। তাছাড়া ওখানকার পুলিস ওদের বিরুদ্ধে কিছু করবে বলেও মনে হয় না আমার। যদি করতে বাধ্য হয়, হয়তো সময় থাকতে সতর্ক

করে দেবে হাবিব বে-কে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল ইসমত পাশা। 'তাহলে…উঁমম!'

'তুমি এক কাজ করো। এয়ারপোর্টে খোঁজ নিয়ে দেখো আজ সকালে কোন চার্টার পার্টি ফ্লাই করেছে কি না। করে থাকলে কতজন ছিল দলে, কোনদিকে গেছে এইসবও জানতে হবে।'

'প্লেনেই কেন, গাড়িতেও তো গিয়ে থাকতে পারে।'

'পারে,' রানা বলল। 'তবে প্লেনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ তাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়।'

'তা ঠিক। কিন্তু তারপর?'

'ওই যে বললাম, রেইড করব ও বাড়িতে!' রানা বলল। 'তুমি কোন সাহায্য যদি করতে পারো, ভাল। নইলে আমি একাই…'

'পাগল হয়েছ নাকি তুমি?' রেগে উঠল ইসমত পাশা। 'ভাবলে কি করে তোমাকে ওই কাজে একা যেতে দেব আমি?'

'আমি ভাবিনি কিছুই, পাশা,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু তোমার লিমিটেশন আছে, তুমি…'

'রাখো তোমার লম্বা লম্বা কথা!' কড়া পুলিসী ধমক লাগাল চীফ। 'রুম ছেড়ে বের হবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার ফোন করব আমি।'

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঠাস্ করে রিসিভার রেখে দিল ইসমত পাশা। লাইন কেটে যেতে হ্যারির রুমে ফোন করল ও। জরুরী তলব পাঠাল।

'আবার কি?' বলল সে। 'একবারে রেডি হয়ে আসি?'

'রেডি হতে হবে না। এয়ারপোর্ট যাচ্ছি না আমরা।'

ওর বলার সুর শুনে বিস্মিত হলো যুবক, কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস হলো না। 'আচ্ছা, আসছি।'

এক মিনিট পর এল হ্যারি, সঙ্গে মানিকজোড়ের মত

ক্লারিসাও। 'কি হলো আবার?' রানার গম্ভীর, চিন্তিত চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল হ্যারি। 'এয়ারপোর্ট যাচ্ছি না, মানে?'

ধীরে ধীরে সব ওদের জানাল রানা। 'এই জন্যে প্ল্যান বদলাতে হয়েছে।'

'কি করতে চাইছ তাহলে?' ফ্যাকাসে মুখে প্রশ্ন করল হ্যারি। ক্লারিসা বসে পড়েছে ধপ্ করে, চেহারা ছাইয়ের মত। দেখে ভয় হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

নিজের প্ল্যান জানাল ও, ইসমত পাশার পরোক্ষ আশ্বাসের কথাও।

'আমিও যাব!' লাফিয়ে উঠেছিল হ্যারি, কিন্তু ওর শীতল চাউনি দেখে চুপ্সে গেল।

'অসম্ভব! এ তোমার কাজ নয়। তুমি ক্লারিসাকে নিয়ে কায়রো যাচ্ছ এখন। করিম যাবে সঙ্গে। হোটেল সেমিরেমিসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে তোমরা।'

'কিন্তু...'

ফোনের বেল শুনে ঘুরল রানা। আধঘণ্টা নয়, দশ মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ করেছে ইসমত পাশা। ও প্রান্তের বক্তব্য মন দিয়ে শুনল রানা, মাঝেমধ্যে 'হুঁ', 'হ্যাঁ,' 'ঠিক আছে' করল। সবশেষে বলল, 'আমি সময় মত থাকব ওখানে। ধন্যবাদ পাশা। অ্যাঁ? হা হা হা...!'

রিসিভার রেখে মানিকজোড়ের দিকে ফিরল ও। 'ইসমাইলিয়া যাচ্ছি আমরা। জানা গেছে সিলভিকে ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

সাত

তুমুল গতিতে ইসমাইলিয়ার দিকে ছুটে চলেছে রানার ভাড়া করা টয়োটা ক্রাউন। একা চলেছে ও। দুপুর গড়িয়ে গেছে, কড়া রোদে ভাজা হচ্ছে প্রকৃতি। অপলক চোখে সামনে তাকিয়ে আছে ও, চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। মরুর তপ্ত বাতাসে চুল উড়ছে। সতর্কতার জন্যে এবারও ছদ্মবেশে আছে ও। বিশেষ ক্রীম মেখে মুখমণ্ডলসহ যে সব অংশ উন্মুক্ত থাকবে, সব স্থানীয়দের মত তামাটে করে নিয়েছে। গালে চমৎকার ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ি।

ইসমাইলিয়া খুব ছোট শহর, মুখচেনা কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হতে পারে বলে এই সতর্কতা।

ইসমত পাশার টেলিফোনের কথা ভাবছে রানা। ওর কথায় কায়রো এয়ারপোর্টে খোঁজ নিয়েছিল সে। জানতে পেরেছে রানার ধারণাই ঠিক। সকাল ন'টার দিকে পোর্ট সাইদের বড় এক ব্যবসায়ীর নামে চার্টার করা একটা ফোর সীটার প্লেন কায়রো ত্যাগ করেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে 'বিশেষ প্রয়োজন' দেখিয়ে ইসমাইলিয়ার দিকে গেছে ওটা।

প্লেনটার যাত্রী ছিল তিনজন বোরখা পরা আরব মেয়ে। এয়ারপোর্ট অফিশিয়ালদের মতে 'সম্ভবত সেই ব্যবসায়ীর বউ-মেয়ে হবে'। তাদের একজন অসুস্থ ছিল, অন্য দু'জন তাকে দু'দিক থেকে ধরে প্লেনে তুলেছে। এরপর সন্দেহের আর কোন অবকাশ

থাকে না। কাজেই খবরটা ওকে জানিয়েই সিলভিকে উদ্ধারের জন্যে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সে।

নিজের ড্রাগস্ ইউনিটের আধ ডজন দুর্ধর্ষ কমান্ডোকে সিভিল ড্রেসে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকে তার একান্ত বিশ্বস্ত। সন্ধে পর্যন্ত হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসের ওপর নজর রাখবে লোকগুলো। তারপর কি, ইসমত পাশা নিজে গিয়ে জানাবে। বন্ধুকে এতবড় ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিল মাসুদ রানা, জবাবে আরেকবার দাবড়ি খেতে হয়েছে। তারই দেশে; সে নিজে পুলিস চীফ হয়েও ওর এই বিপদে সাহায্য করবে না, রানা ভাবল কি করে?

অতএব কথা আর বাড়ায়নি ও। মেনে নিয়েছে। তাছাড়া এর পিছনে আরও একটা কারণ আছে। পৃথিবীর সেরা দশ পুলিস চীফের মধ্যে তিন নম্বর ইসমত পাশা। তার বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত। জুরিসডিকশনের বাইরে হোক আর যেখানেই হোক, সে নিজে যে রেইডে অংশ নেবে, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও সরকারী মহলে তা যে বিশেষ পাত্তা পাবে না, সে কথা পাশা নিজে যেমন জানে, তেমনি রানাও জানে। তাই তাকে আসতে নিষেধ করলেও খুব একটা জোর দিয়ে করেনি ও।

দু'জনের প্রথম পরিচয়ের কথা ভাবল রানা। তখন আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিল পাশা। কয়েক বছর আগে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এক কমান্ডো মিশন পরিচালনার জন্যে মাসুদ রানাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, পাশা ছিল সে মিশনে। কিন্তু দলনেতা বিদেশী দেখে তার নেতৃত্ব মেনে নিতে আপত্তি তোলে সে।

তিক্ততার পর্যায়ে চলে গেল বিষয়টা। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কর্তৃপক্ষ তাকে দল থেকে বাদ দিতে রাজি, কিন্তু রানাকে নয়। পরে আপত্তি তুলে নেয় পাশা, কমিটির সামনে রানার কাছে ক্ষমা

চাইতেও বাধ্য হয়। তার ধারণা ছিল মিশনে গিয়ে রানা এর শোধ নেবে, হয়তো অসম্ভব কিছু দায়িত্ব দিয়ে তার মরার পথ প্রশস্ত করে দেবে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল উল্টো, প্রথম থেকেই ওর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে রেখেছিল মাসুদ রানা। অসম্ভব কোন কাজের দায়িত্ব তো দেয়ইনি, বরং প্রতি পদে পদে সাহায্য করেছে দলের সবাইকে। মিশনের সর্বশেষ মরিয়া অ্যাকশনেও রানাই ছিল সবার আগে। ঝুঁকি শতকরা নব্বই ভাগ রানাই নিয়েছে। এসব দেখে ক্রমে রানার ওপর দুর্বলতা জন্মায় পাশার, ক্রমে তা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

পোর্ট সাইদকে দূর থেকে পাশ কাটাল রানা, তারপর সুয়েয খালের তীর ঘেঁষা হাইওয়ে ধরে এগোল। আর মাইল পঞ্চাশেক গেলে ইসমাইলিয়া। লিটল বিটার লেক ও গ্রেট বিটার লেক হয়ে পাশার নির্দেশিত পথে এগোল রানা। সন্ধের একটু আগে পৌঁছল জায়গামত। ইসমাইলিয়া ফ্রেঞ্চ ক্লাবের প্রকাণ্ড গলফ কোর্সে।

ওকে দেখে নিজের ছাপহীন কার থেকে নেমে এল সিভিল ড্রেস পরা ইসমত পাশা। রানার চেয়ে কমপক্ষে চার ইঞ্চি লম্বা সে, তেমনি বিশালদেহী। চোখের রং হালকা নীল, নাক খাড়া। চেহারায় কঠোর একটা ভাব আছে। এগিয়ে এসে নিজের বিশাল থাবার মধ্যে রানার হাত লুফে নিল সে।

'তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, রানা,' এ-কান ও-কান বিস্তৃত হাসি ফুটল তার প্রকাণ্ড মুখে।

'আমিও খুশি হয়েছি,' রানা বলল। 'আমার জন্যে কষ্ট করে এতদূর ছুটে এসেছ বলে...'

'ফের সেই কথা!' তেড়ে উঠল ইসমত পাশা। 'বলেছি না, আমার সাথে এই ধরনের ফর্মাল কথাবার্তা বলবে না?'

'আচ্ছা, আর বলব না,' মুচকে হাসল ও। 'কখন এসেছ?'

'ঘণ্টাখানেক আগে। মিনিস্ট্রি থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে একটু বেশি সময় লেগেছে, নইলে আরও আগেই আসতে পারতাম।'

'ওরা আপত্তি করেনি?'

'তা তো একটু করবেই। হাজার হলেও ইসমাইলিয়া আমার এলাকা নয়। তবে ম্যানেজ করে নিয়েছি, হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসের কথা অবশ্য জানাইনি। ওয়ারেন্টের "প্লেস অভ রেইড" কলাম ফাঁকা আছে, পরে বসিয়ে নেব।'

'কিন্তু এতে তোমার সমস্যা হবে না?' দ্বিধা ফুটল ওর চেহারায়।

'কচু হবে!' মুখ বিকৃত করে বলল পুলিস চীফ। 'ওয়ারেন্ট ইস্যু করাবার সময় বলেছি কায়রোর এক ড্রাগস চোরাকারবারী হেরোইন নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এখানে পৌঁছবে, ওদের হাতেনাতে ধরব।'

'কিন্তু তা তো হচ্ছে না।'

'হু কেয়ারস!' শ্রাগ করল সে। 'বলব, মাল কখন পৌঁছেছে জানতে পারিনি, তবে ওগুলো হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে গেছে, সে খবর পেয়ে ওখানে রেইড করেছি।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু এ দায়িত্ব ওরা এখানকার পুলিসকে না দিয়ে তোমাকে কেন দেবে?'

'দেবে না কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল পাশা। হেসে উঠল, 'সো-কলড্ চোরাচালানি কায়রোর, সোর্স আমার, মাল যাচ্ছে কায়রোতে, তো দায়িত্ব আমাকে দিতে সমস্যা কি? আমি কি আউটস্ট্যান্ডিং রেপুটেশনের অধিকারী নই? দু'বার প্রেসিডেন্ট, একবার ইউনেস্কো পুরস্কার পাওয়া পুলিস অফিসার নই?'

'তা বটে,' মাথা ঝাঁকাল ও।

পাশাও মাথা দোলাল। 'ওরা অবশ্য পরামর্শ দিয়েছে, যা করার এখানকার চীফকে সঙ্গে নিয়ে করতে। আমি বলেছি চেষ্টা করব। মোট কথা ফাঁক যতটা বন্ধ করা সম্ভব, করার চেষ্টা করেছি।'

'কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত কোন সমস্যা দেখা দেয়? শেষ পর্যন্ত যদি প্রমাণ হয়, ওই বাড়ি সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তা ঠিক না?'

'তুমি ঠিকই শুনেছ, রানা। আমি যাদের পাঠিয়েছি, তারা এর মধ্যেই যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছে হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস্ সম্পর্কে।'

এক ভুরু উঁচু হলো রানার। 'অর্থাৎ এখানকার পুলিস...' পাশার মুখে তিক্ত হাসি ফুটতে দেখে থেমে গেল ও।

'হ্যাঁ,' ঘড়ি দেখল চীফ। প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'একটু পর একজন বাদে টীমের বাকি সবাই ফিরে আসবে এখানে। ওদের সাথে আলোচনা করে কাজে নামব আমরা।'

দেখতে দেখতে আঁধার ঘনিয়ে এল। কোর্সের চারদিকে পোকামাকড়ের কোরাস শুরু হয়ে গেল। থেকে থেকে এক আধটা নিশাচর পাখি ডাকছে। গাড়ির বনেটে বসে গল্প করছে দুই বন্ধু। স্যার কার্টারের আবিষ্কার থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল রানা।

ওর বলা শেষ হতে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইসমত পাশা। 'অদ্ভুত গল্প শোনালে তুমি, রানা। ক্যামবিসিসের যে এমন ইতিহাস আছে, তা এই প্রথম শুনলাম আমি। প-ঞ্চা-শ হাজার সৈন্য! কী আশ্চর্য! এ দেশের প্রাচীন আমলের রাজা-রাজড়াদের ধন-সম্পত্তি নিয়ে কত যে খুনোখুনি হয়েছে, সে-ও আরেক ইতিহাস।'

'ঠিক বলেছ।'

আটটার দিকে এল লোকগুলো, ইসমত পাশার বিশ্বস্ত পাঁচ

কমান্ডো। অন্যজন রয়ে গেছে হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসের ওপর নজরদারি বহাল রাখতে। লোকগুলোকে দেখল মাসুদ রানা–প্রত্যেকে বিশালদেহী, দেখলেই বোঝা যায় অসুরের শক্তি ধরে একেকজন। চলে বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে। নড়াচড়া দেখলে ক্ষিপ্র চিতার কথা মনে পড়ে।

দলনেতার নাম হাসান। সার্জেন্ট মেজর সে। চীফের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফাইনাল রিপোর্ট করল সে। জানাল: বাড়িটা দুর্গের মত সুরক্ষিত। দেয়াল কম করেও বিশ ফুট উঁচু, লোহার গেট। তার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফোকর আছে। কেউ বেল বাজালে ভেতরের গার্ড ফোকর খুলে তার চেহারা দেখে নেয় ভাল করে, তারপর ইচ্ছে হলে গেট খোলে, নইলে খোলে না। দুপুর থেকে অন্তত চারজনকে গেট থেকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে দেখেছে তারা।

নিজেও 'হতাশ' বলে কমান্ডোদের একজন ভাব জমিয়েছিল তাদের একজনের সাথে। লোকটা মাঝবয়সী। কথায় কথায় জানিয়েছে, ও বাড়িতে গাঁজার খোঁজ জানতে গিয়েছিল সে। স্থানীয় এক আড্ডায়, রোজ বিকেলে গাঁজা ও হেরোইনের চালান যায় ওই বাড়ি থেকে, আজ যায়নি বলে খোঁজ নিতে এসেছে সে। কখন চালান যাবে তা জানতে। কিন্তু গার্ড জানিয়ে দিয়েছে আজ চালান যাচ্ছে না, তারা অন্য কাজে ব্যস্ত।

'এখন কি করি বলুন তো?' দুঃখের কাহিনী শেষ করে কমান্ডোকে বলেছে লোকটা। 'রোজ আমার এক প্যাকেট না হলে যে চলে না, তা ব্যাটাদের হাজার অনুরোধ করেও বোঝাতে পারলাম না। কি করি?'

'কি আর করবে!' নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছে কমান্ডো। 'কাছেই তো সুয়েয খাল, ডুবে মরোগে।'

‘বুঝলাম,’ পাশা বলল। ‘লোকটার ঠিকানা জেনে নিয়েছ তো?’

‘নিয়েছি, এফেন্দি,’ জবাব দিল সেই কমান্ডো, নাম মুস্তাফা।

‘গুড! অন্তত একজন সাক্ষী পাওয়া গেল।’ হাসানের দিকে ফিরল সে। ‘দেয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া আছে নিশ্চয়?’

‘জ্বি না,’ মাথা নাড়ল সে। ‘নেই।’

‘ভেতরে মানুষ কতজন আছে মনে হয়?’ রানা করল প্রশ্নটা।

‘গেটে, ওপরের ব্যালকনিতে আর ছাদে সারাদিনে আটজনকে দেখতে পেয়েছি আমরা।’

‘ওদের কারও কাছে অস্ত্র আছে?’

‘না, এফেন্দি। সবাই নিরস্ত্র।’

‘কোন মেয়েকে দেখেননি?’

‘না,’ একটু বিরতি দিল দলনেতা। ‘আমরা ফিরে আসার একটু আগে একটা গাড়ি ঢুকেছে ও বাড়িতে। পিছনের সীটে দু’জনকে বসা দেখেছি। একজন বেশ লম্বা, চোখে হাতল ছাড়া চশমা ছিল।’

‘শের খান!’ উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা।

‘অন্যজন খাটো। বেশ মোটা।’

‘হাবিব বে!’ মুঠো পাকাল ও। ‘কতক্ষণ আগে এসেছে গাড়িটা?’

‘মিনিট বিশেক হবে, এফেন্দি।’

ঝট্ করে ইসমত পাশার দিকে তাকাল ও। ‘আমাদের এক্ষুণি কাজে নামা উচিত, পাশা! ওরা নিশ্চই টর্চার করবে অসহায় মেয়েটার ওপর। হয়তো রেপ করবে ওকে!’

‘শান্ত হও,’ ওর কাঁধে এক হাত রাখল সে। ‘ভেতরে ঢোকার পথ ঠিক করতে দাও, তারপর যাচ্ছি। তুমি নিশ্চই আশা করছ না

আমাদের নক্ শুনে গার্ড গেট খুলে দেবে?'

সার্জেন্ট মেজরের দিকে ফিরল পাশা। 'তোমাদের একজনকে আগে ভেতরে ঢুকতে হবে। ভেতরে গিয়ে গার্ডকে কাবু করে গেট খুলবে সে, তারপর আমরা ঢুকব। আমার গাড়ির বুট খোলো। ভেতরে দড়ি-হুক, টর্চলাইট, আর্মস, অ্যামিউনিশনস্ আছে, স্মোক বম্বও আছে। যে যত পারো নিয়ে নাও। হারি আপ্, মেন! রানা, তুমি লীড দাও, ফ্রেন্ড!'

পনেরো মিনিট পর।

হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসের দুশো গজ দূরে নিঃশব্দে এসে থামল দুটো গাড়ি। সাইড লাইটের আলোয় চলছিল ওগুলো, থামার সাথে সাথে তা-ও নিভে গেল। অপেক্ষমাণ কমান্ডো এগোল সেদিকে। রানা ও পাশাসহ দুই গাড়ির সাত আরোহী বেরিয়ে এল, আবার দু'মিনিট কথা বলল ওরা। রানার হাতঘড়ির সাথে সিনক্রোনাইজ করে নিল প্রত্যেকে।

তারপর দল থেকে আলাদা হয়ে গেল সার্জেন্ট মেজর হাসান ও এক হাবিলদার, মুস্তাফা। হাসানের কাঁধে বড় এক কয়েল দড়ি। গাছের আড়ালে আড়ালে বাড়িটার পিছনদিকে এগোল লোক দুটো।

অনেক বড় জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওটা, পিছনদিক যেমন নির্জন, তেমনি অন্ধকার। ভেতরে আলো আছে, হয়তো, কিন্তু বাইরে তো নেই-ই, দেয়ালেও আলোর কোন বন্দোবস্ত রাখা হয়নি। কয়েলের মাথায় হুক বেঁধে নিয়েই এসেছে হাসান, কাজেই পরের কাজ সারতে তিন মিনিটও লাগল না। অন্ধকারে ছোঁড়া হয়েছে বলে দু'বার দেয়াল মিস্ করল হুক, তৃতীয়বার আটকে গেল। রাবারমোড়া হুক হওয়ায় কোন আওয়াজ হলো না।

দড়ি টেনে, ঝুল্ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল হাসান, তারপর সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে তরতর করে উঠতে শুরু করল। তাকে দেয়ালের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ঘুরে দাঁড়াল মুস্তাফা, মূল দলে যোগ দিতে চলল।

মেইন গেটের কাছে একদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা, দুই কমান্ডো আছে ওর সাথে। অন্যরা আছে ইসমত্ পাশার দলে, উল্টোদিকে। এক এক করে দীর্ঘ দশ মিনিট কেটে গেল, কোন সাড়া নেই সার্জেন্ট মেজরের। একদম নীরব ভেতরে। ভর সন্ধেয় প্রেতপুরীর মত লাগছে বাড়িটাকে।

হতাশ হয়ে নতুন কিছু করার কথা ভাবতে শুরু করেছিল রানা, তখনই আওয়াজটা শোনা গেল– কাঠের ভারী বোল্ট টেনে খোলার।

'তালাল!' আচমকা বাড়ির দিক থেকে মোটা একটা ক্রুদ্ধ গলা ভেসে এল। খুব সম্ভব অন্ধকার ব্যালকনিতে ছিল কেউ, আওয়াজ শুনে ফেলেছে। 'তালাল!'

'হাদরা, এফেন্দি!' হাসানের কণ্ঠ শোনা গেল, গার্ডের অনুকরণে জবাব দিল সে।

'গেট খুলেছ কেন?'

জবাব নেই; অপেক্ষমাণ সবাই ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

'গেট খুলেছ কেন?'

হাসান নিরুত্তর। বোল্ট লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তার সঙ্গীদের একজন ততক্ষণে পড়ে থাকা গার্ডকে বেঁধে ফেলেছে। মাথার পাশে হাসানের পিস্তলের বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে সে।

ব্যালকনির লোকটা চেঁচাতে শুরু করেছে, আরও কয়েকটা গলা যোগ দিয়েছে ওটার সাথে। এর মধ্যে ভেতরের পরিস্থিতি

বুঝে নিয়েছে রানা। বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, বাগান। বাগানের মধ্যে দিয়ে চমৎকার বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে বিশাল পোর্টিকো পর্যন্ত। বাড়িটা পুরানো ধাঁচের। বিরাট। কিন্তু সেই তুলনায় আলো কম।

দূর থেকে ভেতরের বড় হলরুম দেখতে পেল রানা, প্রকাণ্ড দরজা হাঁ করে খোলা। ভেতরে ওপরে ওঠার চওড়া পাথরের সিঁড়ি। দুই প্রকাণ্ডদেহী নিগ্রোকে দেখতে পেল, দৌড়ে নেমে আসছে। পরনে শুধু পাজামা। হাতে স্মল আর্মস।

পাশার সাথে ইশারায় কথা হলো রানার। পরমুহূর্তে অন্যদের উদ্দেশে চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ও, 'চার্জ!'

ঝড়ের গতিতে হলরুমের দিকে ছুটল সবাই। সিঁড়ি ডিঙিয়ে হলরুমে পা রাখল দুই নিগ্রো, পরক্ষণে দোরগোড়ায় রানা ও পাশাকে দেখে আঁতকে উঠে পিস্তল তুলতে গেল একজন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবর্ষণ করল রানার ওয়ালথার পিপিকে, ব্যাটার ডান চোখ দিয়ে ঢুকে পিছনের খুলি উড়িয়ে দিয়ে গেছে বুলেট। পরেরটাকেও গুলি করল ও, কিন্তু কাজ হলো না। তার সামান্য আগেই জায়গা বদল করেছে লোকটা। মেঝেতে শুয়ে পড়ে গলার জোরে চেঁচাতে শুরু করেছে।

এক সেকেন্ড পর দপ্ করে নিভে গেল বাতি। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস।

কিন্তু ততক্ষণে দিক্ নির্দেশ পেয়ে গেছে রানা, কাজেই পথ খোঁজার দরকার হলো না। দৌড়ের ওপর কোমরে গোঁজা টর্চ লাইট বের করে ফেলল ও, একেক লাফে তিন-চার ধাপ সিঁড়ি টপ্কে উঠে যেতে লাগল। ওর ঠিক দু'হাত পিছনে রয়েছে ইসমত পাশা।

ঝড়ের গতিতে ওপরের ল্যান্ডিঙে পৌঁছে গেল ওরা। চারদিক

থেকে চেঁচামেচির শব্দ আসছে, প্রচুর মেয়ে কণ্ঠও আছে তার মধ্যে। সবাই বিভ্রান্ত, বিরক্ত, ভীত সন্ত্রস্ত। দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। সামনে ইংরেজি T-এর মাথার মত দুই করিডর চলে গেছে দেখে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা, পাশাকে একটা দেখিয়ে নিজে অন্যটা ধরে ছুটল।

এই সময় কাছেই কোথাও গুলি হলো, পর পর দুটো। পরক্ষণে মেয়েলী চিৎকার ও ধুম্ ধাম্ দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। এক মুহূর্ত বিরতির পর মহা হুলস্থূল বেধে গেল চারদিকে–গোলাগুলি, চিৎকার আর কান্নাকাটিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোটা বাড়ি।

থামল না রানা, টর্চের আলোয় চারদিকে সতর্ক নজর রেখে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটতে লাগল। সামনে বন্ধ দরজা দেখলেই হয় লাথি মেরে, নয়তো গুলি করে তালা উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকছে সিলভির খোঁজে। কিন্তু নেই সে। কেউ নেই, রুম ফাঁকা। দোতলা দেখা শেষ করে তিনতলায় ওঠার জন্যে ঘুরল, এই সময় আরেক নিগ্রোর ওপর চোখ পড়ল। হাতে পিস্তল। আত্মরক্ষার কথা না ভেবে ঝড়ের গতিতে ওর দিকেই ছুটে আসছিল লোকটা, রানা ঘুরে দাঁড়াতে ব্রেক কষল, পিস্তল তুলতে গেল।

কিন্তু রানার তুলনায় হাজার গুণ ধীর লোকটা, অস্ত্র ধরা হাত চার ইঞ্চি তোলার আগেই বুকে-পেটে তিনটে গুলি খেয়ে উড়ে গেল সে। কয়েকবার এদিক-ওদিক দৌড়ে সিঁড়ির খোঁজ পেল রানা। ছুটল সেদিকে। কয়েক পা যেতে না যেতে ওপরের ল্যান্ডিঙে শের খানকে পলকের জন্যে দেখতে পেল ও, সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত একদিক থেকে বের হয়ে আরেকদিকে ছুটে গেল লোকটা। তাড়া করল রানা। নিচ থেকে পাশা ও হাসান তখন সমানে চেঁচাচ্ছে,

'পুলিস! পুলিস! সাঁরেন্ডার! সারেন্ডার!'

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো, ঠুস্-ঠাস্ বাধা যা আসছিল, মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। মনে মনে হাসল রানা সঠিক সময় 'পুলিস' নামের মাহাত্ম্য টের পেয়ে। বিনা বাধায় তিনতলায় উঠে এল, দু'দিক থেকে অনুসরণরত দুই কমান্ডো ছুটে গেল সামনে। প্রথম বন্ধ দরজার সামনে থেমে হাঁক ছাড়ল রানা, 'পুলিস! ভেতরে কে আছ দরজা খোলো, নইলে গুলি করে ভাঙব দরজা।'

ভেতর থেকে বিদেশী টানে 'নো! নো!' বলে চেঁচিয়ে উঠল এক মেয়ে। দোন্ত সুট!'

'ওকে! দরজা খোলো,' বলে সঙ্গীদের দিকে ফিরল ও। 'সব রুম খুঁজে দেখুন। এই ফ্লোরেই আছে মেয়েটা।'

'সেই শের খান, না কি যেন, ওকে…' একজন শুরু করেছিল। কিন্তু বাধা দিল রানা।

'ওকে পরে ধরলেও চলবে।'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা খুলে গেল, একটা কচি চীনা মুখ উঁকি দিল। অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটা, কিন্তু চেহারায় এক ফোঁটা রক্তও নেই এ মুহূর্তে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল রানা, কিন্তু দরকার হলো না, মেয়েটা দরজা পুরো মেলে ধরতেই সিলভির ওপর চোখ পড়ল। রুমের এক কোনায় মেঝেতে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

রানাকে দেখে প্রথমে সন্দেহ, তারপর অবিশ্বাস ফুটল তার চোখে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। 'রা-রানা!' কোনমতে বলল।

অভয়ের হাসি হাসল ও। একই সাথে বুকে চেপে থাকা বিশ মণ ওজনের পাথরটা সরে গেল। হাত বাড়াল। 'এসো। আর ভয় নেই।'

এই সময় হুড়মুড় করে ফিরে এল ওর দুই সঙ্গী। 'জলদি

চলুন, এফেন্দি। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা,' একজন বলল হাঁপাতে হাঁপাতে।

'আগুন!' চমকে উঠল রানা। বুঝে ফেলল সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলার জন্যে করা হয়েছে কাজটা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জলদি আসুন!' বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ সিলভির ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল। 'ইনিই সেই...?'

'হ্যাঁ। এই ফ্লোরে আর কেউ নেই?'

'না, এফেন্দি। কেউ নেই। সেই লোকটাকেও দেখলাম না কোথাও।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, যেন শের খানকে না পেলেও কিছু আসবে যাবে না। আসলে তা নয়, ওর মন জানে লোকটার সাথে আবার দেখা হবে ওর। হতেই হবে। এইটুকুতেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার বান্দা নয় লোকটা।

'চলো, সিলভি!'

ভয়ে কাঁপছে এখনও মেয়েটা, হাঁটতে পারছে না ঠিকমত। ওর অবস্থা দেখে মায়া হলো রানার, সময় নষ্ট না করে একটানে কাঁধে তুলে নিল ওকে। তারপর চীনা মেয়েটাকে সঙ্গে আসতে বলে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

আটক চোদ্দজন মেয়েকে নিয়ে কমান্ডো দল যখন নিরাপদ দূরত্বে সরে এল, তখন গোটা হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস দাউ দাউ করে জ্বলছে। শের খান বা হাবিব বে দূরের কথা, বাড়ির একজন কর্মচারীরও দেখা নেই।

কোনদিক দিয়ে যে হাওয়া হয়ে গেল মানুষগুলো, কে জানে!

ওই রাতেই সিলভিকে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ফিরল মাসুদ রানা। মুক্তি পেয়েও ভয় কাটেনি ওর, সিটিয়ে আছে। তার সাথে আছে

বাবা, স্যার কার্টারের মৃত্যুশোক। পরিস্থিতি সামাল দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো রানাকে।

পরদিন বিকেলে লন্ডনের উদ্দেশে ছেড়ে গেল এস.এস. হ্যাম্পশায়ার, স্যার কার্টারের কফিন গেল ওটায়। কোন আনুষ্ঠানিকতা হলো না, একেবারে সাধারণভাবে সারা হলো সব। পুরোটা সময় মোটামুটি শান্তই ছিল সিলভি, কিন্তু জাহাজের ঘাট ছাড়ার শেষ হুইসল বেজে ওঠামাত্র কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ও একটু সুস্থির হতে সন্ধের পর রানার হোটেল রুমে জরুরী বৈঠক বসল। রানা-সিলভি, হ্যারি-ক্লারিসা ও করিম থাকল তাতে। অভিযানের যাবতীয় খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করতে এসেছে ওরা।

ওদিকে হাউস অভ অ্যাঞ্জেলস্ থেকে উদ্ধার করা মেয়েদের নিয়ে আগের দিন কায়রো ফিরে গেছে পুলিস চীফ ইসমত পাশা। তার রেইড এক অর্থে সফল হলেও অন্য অর্থে ব্যর্থ হয়েছে। বাড়িটার মালিক হিসেবে অন্য একজনের নাম থাকায় হাবিব ইসমাইল বে মুঠো ফসকে বেরিয়ে গেছে। কায়রোয় ইসমত পাশার নাকের ডগাতেই রয়েছে সে আর শের খান, কিন্তু কিছু করার নেই তার।

ওরা নতুন সুযোগের অপেক্ষায় আছে, বুঝে ফেলল রানা। পেলেই আবার কামড় বসাতে চেষ্টা করবে। এত সহজে পরাজয় নিশ্চয় মেনে নেবে না ওরা। ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবল রানা, ততই নিশ্চিত হলো যে আবার দেখা হবে ওদের। অন্তত একবারের জন্যে হলেও। ওরও ইচ্ছে হোক। শের খানের সাথে শেষ বোঝাপড়াটা তাহলে সেরে নেয়া যাবে।

গভীর রাতে হেরু-টেমের দুই খণ্ড কবর ফলক নিয়ে বসল ওরা। একসাথে জুড়ে নিয়ে ওটার হিজিবিজি হায়ারোগ্লাফিক ভাষা দেখতে লাগল সিলভি কার্টার। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ মেয়েটা।

ভরাট দেহ। একটু লম্বাটে মুখ, বড় বড় নীল চোখ। চুলের রং বাদামী। অপূর্ব মিষ্টি চেহারা। দীর্ঘদিন মিশরে থাকায় গায়ের রং একটু তমাটে হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে বরং আরও মোহনীয় লাগছে ওকে। এ মুহূর্তে বিষণ্ন। ওদের সবাইকে এক পলক দেখে নিয়ে পড়তে শুরু করল সে।

' "আমি, হেরু-টেম, দেবতাকুলের সম্রাট, এই মহাবিশ্বের শাসক, ওসিরিস, পবিত্র মাতা হাথর-আইসিস, এবং রাজকীয় বাজ হোরাসের শপথ করে বলছি, এই ফলকে আমি যা লিখে রেখে গেলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি"।'

এর পরের কয়েক প্যারায় ক্যামবিসিসের থিবস দখল থেকে শুরু করে সিওয়া যাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছে হেরু-টেম। ওটুকু আপাতত বাদ রেখে আসল অংশ পড়তে আরম্ভ করল সিলভি। আর সবার নজর সেঁটে আছে ওর মুখের ওপর। গভীর রাতে, নির্জন হোটেল রুমে অদ্ভুত এক আবহ সৃষ্টি করেছে হাজার হাজার বছর আগে কোন এক হেরু-টেমের লিখে রেখে যাওয়া বক্তব্য।

' "পুরো বাইশ দিন একটানা এগিয়ে গিয়েছি আমরা, কোনদিকে তাকাইনি। না ডানে, না বাঁয়ে। আর তিনদিন চলতে পারলেই পৌঁছে যাব গন্তব্যে। কিন্তু সেই রাতেই বিশ্বাসঘাতকতা করল সেনাসি আরবরা, পালিয়ে গেল আমাদের ফেলে। ফলে সে রাতে পানির মজুতের কাছে পৌঁছতে পারিনি আমরা। দীর্ঘ কষ্টকর যাত্রার পর রাতে পানির অভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিল"।

"...অনেক খুঁজেছি। তবু পরদিনও পানির খোঁজ পেলাম না। উন্মাদ হয়ে উঠেছে সৈন্যরা, দুই দিন পানি ছাড়া মার্চ-কাউন্টার মার্চ করে আমরাও হতাশ। তৃতীয় দিন ক্যামবিসিস নিরুপায় হয়ে ফিরে চলার নির্দেশ দিলেন আমাদের। মানুষ তখন তেষ্টায় অস্থির,

মরতে শুরু করেছে। মন থেকে ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি আশা নেই। এবার মৃত্যু অবধারিত"।

' "তাই পালাব ঠিক করলাম। দল ছেড়ে যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাব। যেখানে মৃত্যু আমাদের ছুঁয়েছে, সেখানে আর থাকা যায় না। চারদিকে এত হাহাকার, এত মৃত্যু; মানুষ-ঘোড়ার, চোখে দেখা যায় না। আমি যে কি ভাবে বেঁচে থাকলাম, নিজেও জানি না। ওরই মধ্যে পর পর দু'রাত নক্ষত্রের অবস্থান খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ করলাম, তার সাথে আমাদের অবস্থান মিলিয়ে নিয়ে সবার অজান্তে সরে পড়লাম আমি।"

" 'ও লর্ড, ওসিরিস, জায়গাটা অক্ষাংশ ২৮ ডিগ্রী ১০ ইঞ্চি উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ২৫ ডিগ্রী ৩৩ ইঞ্চি পূর্বে। গিজার পিরামিডকে কেন্দ্র করে হিসেব করেছি আমি। হে মহাবিশ্বের শাসক, ও মাতা হাথর, ও সম্রাটপুত্র হোরাস, আমার কাপুরুষতাকে তোমরা ক্ষমা কোরো। মৃত্যুর পর আমার নাড়িভুঁড়ি যাতে মৃতদেহখাদক আম-মিটের সামনে ছুঁড়ে দেয়া না হয়, আমি যেন পবিত্র ভূমি সেখেত-আরুতে চির শান্তি লাভ করতে পারি, তোমরা দয়া করে…",' থামল সিলভি।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল প্রত্যেকে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে--কথা নেই, নড়াচড়া নেই। অনেক, অনেকক্ষণ পর রানা মুখ খুলল প্রথমে। কোনমতে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল ও, 'বিশ্বাস হতে চায় না।'

পরদিন সকালের ট্রেনে রানার তৈরি করা দীর্ঘ এক তালিকা নিয়ে ওয়েসিস অভ দাখলার পথে চলে গেল করিম। কায়রো হয়ে যাবে লোকটা। সেখান থেকে দলের জন্যে নিজের পরিচিত, বিশ্বস্ত কিছু লোক, তাঁবু, খাবার-দাবার ইত্যাদি জোগাড় করে দাখলায় অপেক্ষা

করবে।

অভিযানের ব্যাপারে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুমতিসহ আরও কিছু অপরিহার্য কাজ, কেনাকাটা ইত্যাদি সারতে হবে রানাকে। সব সেরে সাতদিন পর করিমের দলের সাথে যোগ দেবে অন্যদের নিয়ে।

কায়রোতেই পরবর্তী আক্রমণ আসবে ভেবে সতর্ক ছিল রানা, কিন্তু এল না। শের খান বা হাবিব বে-র টিকিরও দেখা পাওয়া গেল না। কাজ শেষ করে লটবহর নিয়ে পাঁচদিন পর যাত্রা করল ওরা। চার্টার করা প্লেনে উত্তর-পশ্চিমের মরু শহর এল-খারগা পৌঁছল প্রথমে। ওখানে খবর পাওয়া গেল, তিনদিন আগে একদল বেদুইনকে ওয়েসিস অভ দাখলার ক্যারাভ্যান রুট ধরে যেতে দেখা গেছে।

ওটা করিম, বুঝল রানা। রিফুয়েলিং সেরে আবার এক ঘণ্টা পর আকাশে উঠল ওরা, ধু-ধু বালির মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। কাসার-দাখলা, ওয়েসিস অভ ফারফ্রা ছাড়িয়ে আক্ষরিক অর্থেই আরেক বালির মহাসমুদ্রে পড়ল প্লেন। গ্র্যান্ড মেয়ার ডি স্যাবল ওটার নাম, ইংরেজিতে সী অভ স্যান্ড। চারশো মাইল দীর্ঘ।

ওটার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিছিয়ে রয়েছে ওয়েসিস অভ সিওয়া বা প্রাচীন কালের ওয়েসিস অভ জুপিটার-আম্মন। ক্যামবিসিসের নিরুদ্দেশ ধন-সম্পদের ঠিকানা। আফ্রিকার নো-ম্যান'স ল্যান্ড।

সেদিকে তাকিয়ে অল্পক্ষণেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। দুপুরের উত্তাপে ধোঁয়ার মত অদৃশ্য, কাঁপা কাঁপা ঢেউয়ের জন্যে কিছু দেখার উপায় নেই। দুপুরের একটু পর দাখলায় ল্যান্ড করল প্লেন। ওদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসা করিমকে দেখে

চমকে উঠল রানা। মশার কামড়ে ফুলে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে তার মুখ। লাল হয়ে আছে। অন্যদের অবস্থাও সঙ্গীন।

দিনে বেলেমাছি, রাতে মশা, এই হলো মরুভূমির সার্বক্ষণিক যন্ত্রণা। সূক্ষ্ম মশারিও ঠেকাতে পারে না ওদের। এছাড়া বিষাক্ত সাপ তো রয়েইছে। ওদের দিন-রাত দুই-ই সমান।

রানার পরামর্শ অনুযায়ী কাসার-দাখলা থেকে চারটে লরি ও দুটো কার ভাড়ায় নিয়ে এসেছে করিম। ওগুলো দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা। চমৎকার টিউন করা এঞ্জিন। টায়ার বেলুনের মত, অনেক চওড়া। দুটো পানির লরি, বাকি দুটো রসদ ও অন্যদের বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কার দুটো ওরা নিজেরা ব্যবহার করবে। কারের জন্যে ড্রাইভার নেই, লরির আছে। রেন্টাল কোম্পানির কর্মচারী ওরা।

অসময়ে লাঞ্চ খেয়ে চারটার দিকে যাত্রা শুরু করল রানা। সুদীর্ঘ, ধীর যাত্রা। কম্পাস কোর্স ধরে চলার প্রশ্নই আসে না এ ক্ষেত্রে, পথের প্রতিটি মাইল হয় হেঁটে, নয়তো কারে করে স্কাউটিং করতে করতে যেতে হবে। পথ আগে থেকে ঠিক করে তবে লরি নিয়ে এগোতে হবে, নইলে একটু এদিক-ওদিক হলেই ফেঁসে যেতে হবে।

সন্ধে পর্যন্ত খুব সামান্যই এগোতে পারল দল। তাঁবু ফেলে রান্নার আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল করিমের জোগাড় করা দুই কুক। এদের সরাসরি কায়রো থেকে এনেছে সে, দু'জনেই আত্মীয়।

এখানে কোন নিরাপত্তা নেই, বেদুইন ডাকাতরা কোন আইন মানে না, নিজেদের গড়া আইনে চলে। তাই প্রথমেই সশস্ত্র গার্ড বসাল রানা। তারপর অন্য কাজে মন দিল।

আট

পরদিন আলো ফোটার আগেই নাস্তা খেয়ে নিল ওরা, ক্যাম্প গুটিয়ে যাত্রা শুরু করার জন্যে প্রস্তুত হলো। এই দলে ওরা সাতজন। রানা, হ্যারি, সিলভি, ক্লারিসা, করিম এবং দুই আরব সার্ভেন্ট—মুসা ও ওমর। শেষের দুজনকে বাদ রেখে দলের বিভিন্ন দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়েছে ওরা।

হ্যারির ওপর রয়েছে ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব, ক্লারিসার ওপর স্টোর। সিলভি নিয়েছে নেভিগেশনের দায়িত্ব। এ-কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ মেয়েটি। রোজ মাঝদুপুরে সূর্যের ওপর ভিত্তি করে লগারিদম দেখে দলের অবস্থান বের করে ও, তারপর পরবর্তী গন্তব্যের কম্পাস কোর্স বের করে। এ কাজে রানা নিজেও মোটামুটি অভিজ্ঞ, সিলভির হিসেবে যে একচুল ভুল হয় না, তা আগেই পরখ করে দেখেছে ও। এখন আর বিষয়টা নিয়ে একদম মাথা ঘামায় না। আরব গাইডদের পরিচালনার কাজও করে সিলভি, কেন না স্থানীয় আরবীতে ওপর ওর ভাল দখল আছে। কনভয় ওর নির্দেশেই চলে।

রানা হলুদের গুঁড়ো। সব কাজেই হাত লাগায় দরকার মত। এছাড়া দুপুরের বিশ্রাম ও রাতের ক্যাম্প করার জায়গা বাছাই করাও ওর কাজ। করিমের কাজ হচ্ছে ব্যাগেজ লোডিং-আনলোডিং, তদারক করা ইত্যাদি।

ছ'টার দিকে যাত্রা শুরু করল ওরা। সাড়ে আটটার দিকে হলদে বালির মহাসাগরে দুই আগন্তুকের দেখা পাওয়া গেল। বেশ দূরে উটের পিঠে বসে আছে, নজর এদিকে। নড়ছে না। রানার মনে হলো ওদের কাছে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। ক্রমে দলটা ভারী হলো, ওরা যে ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে, তার আড়াল থেকে আরও জনাদশেক উটসওয়ার বেরিয়ে এল। সবাই মিলে একভাবে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। আচরণে বন্ধুত্বের বা শত্রুতার, কোনরকম আভাস নেই। নীল পট্টিতে মুখ ঢাকা সবার।

দলের যে ক'জন ওদের থেকে এগিয়ে ছিল, ছুটতে ছুটতে ফিরে এল তারা। উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে কি সব বলছে। 'ওরা ডাকাত!' শান্ত গলায় ওদের বক্তব্য তরজমা করল সিলভি। 'আমাদের তৈরি থাকা দরকার।'

এরকম কিছুই সন্দেহ করেছিল রানা। এদের সম্পর্কে ওর জানা আছে, বিচ্ছিন্ন পাহাড়ী উপজাতি ওরা, যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি হিংস্র। তারওপর ধর্মান্ধ। মুখে পট্টি বেঁধে উত্তর আফ্রিকার মরুদ্যানের পর মরুদ্যান চষে বেড়ায়। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ ব্যবসায়ীদের ওপর।

মরুভূমিতে কোন আইন নেই, পেশী শক্তিই সব, কথাটা কারও অজানা নয়। তাই সবরকম প্রস্তুতি নিয়েই পা বাড়িয়েছে রানা। দলের প্রত্যেকের সঙ্গেই আছে আধুনিক রাইফেল। এছাড়া রানা, সিলভি ও ক্লারিসার সঙ্গে অতিরিক্ত পিস্তলও আছে একটা করে।

আরও এগোতে লোকগুলোর মাথার পাশে সরু সরু কাঠি দেখতে পেল রানা। আসলে কাঠি নয়, রাইফেলের নল। পুরানো মডেল বলে নল বেশি দীর্ঘ ওগুলোর, কোন কোনটা ওদের মাথার এক ফুটেরও ওপর পর্যন্ত উঠে আছে। ওই অস্ত্র দিয়ে সুবিধে

করতে পারবে না ব্যাটারা, রানা ভাবল। লড়াই বাধলে ওদের কাবু করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

কনভয় দাঁড় করাল রানা, সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে রাইফেল নিয়ে গাড়ির আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ওরা অবিচল দেখে পরিস্থিতি সুবিধের মনে হলো না উটসওয়ার বাহিনীর, খানিক পর রণে ভঙ্গ দিল। দূর থেকে তাদের একজনকে নড়ে উঠতে দেখল রানা, পা দিয়ে উটের পেটে আঘাত করল সে, পরক্ষণে ঢালের ওপাশে গায়েব হয়ে গেল গোটা দল। একটু পর ওখানটায় পৌঁছে কারও দেখা পেল না ওরা। দিগন্তের কোথাও চিহ্ন পর্যন্ত নেই ব্যাটাদের।

আবার চলা শুরু হলো। টানা তিন ঘণ্টা এগিয়ে বিশ্রামের জন্যে থামল দল, অস্থায়ী ক্যাম্প দাঁড় করানোর পর নিয়ম অনুযায়ী কয়েকজন গাইড ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সেন্ট্রির দায়িত্ব পালন করবে। ওরা যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা চিৎকার ভেসে এল। আওয়াজ অনুসরণ করে তাকাতে আরেক দলের ওপর চোখ পড়ল সবার। এরাও উটসওয়ার বাহিনী, সংখ্যায় আগেরটার চারগুণ বড় হবে।

প্রমাদ গুণল রানা, তাড়াতাড়ি চোখে ফিল্ড গ্লাস লাগিয়ে তাকাল। না, ডাকাত নয় ওরা, ব্যবসায়ী। প্রতিটা উটের পিঠে মাল বোঝাই বড় বড় স্যাক। রাইডারদের মুখে পট্টিও আছে, তবে সাদা। আধঘণ্টা পর ওদের কাছাকাছি পৌঁছল দলটা, এক বৃদ্ধ ও এক যুবক দল ছেড়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

রানা যেমন বুঝল বৃদ্ধই দলটির নেতা, তেমনি সে-ও বুঝল এই দলের প্রধান কে। উট থেকে নেমে হাসিমুখে এগিয়ে এল সে রানার দিকে। দু'হাত প্রসারিত, মুখে আন্তরিক হাসি। 'আসসালামু আলাইকুম!' দরাজ কণ্ঠে হাঁক ছাড়ল লোকটা।

সালামের জবাব দিল ও, এরপর আরবী কেতা অনুযায়ী আলিঙ্গনের পালা। দুই মেয়ে বাদে আর সবার সাথে সালাম ও আলিঙ্গন বিনিময় করল তিন আগন্তুক। বৃদ্ধ নিজের পরিচয় দিল শেখ আবু হাফিজ বলে, বাড়ি ওয়েসিস অভ ফারফ্রা। একশো মাইল দক্ষিণের ওয়েসিস অভ বালাস যাচ্ছে সে ব্যবসার কাজে, সঙ্গের দুই যুবক তার ছেলে।

ওদের পঞ্চাশ গজ দূরে নিজেদের তাঁবু গাড়ল দলটা। এরপর খাবার বিনিময় করার পালা–মরুভূমির রীতি এটা, পথে দু'দলের দেখা হলে করতে হয়। রানা পাঠাল কিছু চা ও দু'কেজি ওজনের এক প্যাকেট চিনি। মরুভূমিতে চিনির কদর খুব বেশি, প্রায় নগদ টাকার মত। খুশি হয়ে এক ছড়া কলা ও কমলার রসের শরবত পাঠাল শেখ হাফিজ।

খাওয়া শেষে এক ছেলেকে দিয়ে চায়ের নিমন্ত্রণও পাঠাল। ফিরিয়ে দেয়ার রেওয়াজ নেই, বাধ্য হয়ে তাই যেতে হলো ওদের। সিলভি ও ক্লারিসাও গেল, আরব মেয়েদের ঢোলা জোব্বা ও নেকাব পরে। চা ও আলোচনা পর্ব চলল ঘণ্টাখানেক। তারপর পরস্পরের কাছ থেকে বিদেয় নিল দু'দল। তার আগে সকালে দেখা ডাকাত দল সম্পর্কে বৃদ্ধকে সতর্ক করল রানা।

খুশি হলো শেখ হাফিজ, ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর চেহারার আধা ডজন কুচকুচে কালো লোককে ইঙ্গিত করে জানাল, ওদের ঠেকাতেই এরা আছে দলের সাথে। সুদানীজ বডিগার্ড এরা। মার্সেনারি। অলস, লোভী, তবে বেঈমানী করে না কখনও। লড়াই বাধলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এরা। মরুভূমির ডাকাতরা তা খুব ভাল করে জানে। কাজেই যে ক্যারাভ্যানে সুদানীজ বডিগার্ড থাকে, তার দিকে ভুলেও এগোয় না।

আরেক দফা আনুষ্ঠানিক বিদায় সম্ভাষণ বিনিময়ের পর যার

যার পথে যাত্রা করল দু'দল। এক ঘণ্টা পর উঁচু এক বালির ঢিবির আড়ালে চলে গেল শেখের দীর্ঘ ক্যারাভ্যান। এরপর অনেকদিন পর্যন্ত আর কোন মানুষের দেখা পেল না ওরা! রাতে এক দীর্ঘ পাথুরে উপত্যকার পায়ের কাছে ক্যাম্প করার নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। রাতের খাওয়া সেরে চা খেল ওরা, কিছু সময় গল্প গুজব ও পরের দিনের অগ্রাযাত্রা নিয়ে আলোচনা করল। তারপর ঘুম।

দাখলা ছেড়ে আসার তৃতীয় দিনে সত্যিকারের বালির মহাসমুদ্রে পা রাখল দল। চারদিকে যতদূর দেখা যায়, হলুদ বালি আর বালি। এ ক'দিনও বালির মধ্যে দিয়েই চলেছে ওরা, তবু তার মধ্যেও কিছু কিছু পাথরের চিহ্ন ছিল। প্রয়োজনে ল্যান্ডমার্কের মত ব্যবহার করা যেত সেসব। এখানে তার কিছুই নেই, কিচ্ছু না।

আছে কেবল দিগন্ত পর্যন্ত বালির বড় বড় ঢেউ আর আধ মাইল পর পর দীর্ঘ ঝোপের সারি। সবগুলো একইরকম, দেখে আলাদা করার সাধ্য নেই কারও। ঢেউয়ের চুড়োয় উঠলে চারদিকের কয়েক মাইল দেখা যায়, নইলে কেবলই আকাশ আর বালি, বালি আর আকাশ।

কোন কোন রিজ পাঁচশো ফুট কি তারও বেশি উঁচু, ফলে পথ অনেক বেশি অতিক্রম করতে হচ্ছে, তারওপর আছে অনবরত ওঠা-নামার কষ্ট। এছাড়া কিছু ঢাল এত খাড়া যে সব লরি উঠতে পারে না। কোনটা ফেঁসে গেলে মালপত্র আনলোড করে অন্য গাড়ির সাহায্যে টো করে তুলতে হয় সেটাকে, তারপর আবার লোডিঙের একঘেয়ে, ক্লান্তিকর ঝক্কি।

দলে পানির কো[illegible] ঘাটতি নেই, বরং হিসেবের চেয়ে যথেষ্ট বেশিই এনেছে রানা, তবু কয়েকদিন যেতে না যেতে মরীচিকা দেখতে শুরু করল প্রত্যেকে। উপত্যকার নিচে প্রায়ই বড় বড়,

শান্ত লেক দেখতে পাচ্ছে রানা, কখনও ওগুলোর চারধারে সবুজের ছোঁয়াও থাকে, ঘাস বলে মনে হয় ওগুলোকে।

মাঝেমধ্যে খেজুর গাছ, মাটির দেয়ালের ঘরবাড়িসহ গোটা একটা গ্রাম, এমনকি অনেক দূরে সাদা গম্বুজ ও মিনারওয়ালা মসজিদও চোখে পড়ে। ব্যাপারটা মন্দ লাগছে না রানার, বরং ভালই লাগছে। একটা কিছু দেখে একঘেয়েমী অন্তত কাটে।

কড়া রোদে চারদিক জ্বলছে যেন, চোখে গাঢ় রঙের র‍্যাপঅ্যারাউন্ড সানগ্লাস থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই সমস্যা হচ্ছে। ঝল্‌সে যাচ্ছে দৃষ্টি। কয়েকদিনের মধ্যে সবার ত্বক পুড়ে স্থানীয়দের মত তামাটে হয়ে গেল। প্রায়ই ঝড়ের মুখে পড়ছে দল, উড়ন্ত খুদে বালুকার আঘাতে দেহের খোলা অংশের চামড়ার অবস্থা করুণ সবার, তবু থেমে থাকছে না কাজ, চলছে।

পঞ্চম দিন দুপুরের আগে ক্যামবিসিসের নিখোঁজ সেনাবাহিনীর উন্মুক্ত গণসমাধির খোঁজ পেল ওরা। সকাল দশটার দিকে গাইডদের একজন হাত তুলে দেখাল কিছু একটা। তাকাল ওরা, দেখল সীমাহীন হলদের রাজত্বের অনেকটা জুড়ে অন্যরকম রং। মেটে মেটে। দ্রুত সেদিকে এগোল সবাই, পরীক্ষা করে বোঝা গেল বড় বড় পানি ভরতি ওয়াইন জারের ডাম্প ছিল জায়গাটা। নিশ্চয়ই তিন হাজার জার ছিল।

আড়াই হাজার বছরের বাতাস বালি সরিয়ে উন্মুক্ত করে ফেলেছে ওগুলোকে, রোদে ফেটে-চিরে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। প্রায় এক ঘণ্টা কাটাল ওরা সেখানে, খুঁজে দেখল ওসবের মধ্যে আরও কিছু আছে কি না। নেই। শুধু জারের টুকরো, ভঙ্গুর অংশ। ধরলেই শুকনো পাতার মত গুঁড়িয়ে যায়।

যতক্ষণ ওখানে ছিল, ততক্ষণই কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা। এর কারণ, হেরোডোটাসের ইতিহাস যে

মিথ্যে নয়, হেরু-টেমের ফলকে যে সত্যি কথাই লেখা আছে, চোখের সামনে তার প্রমাণ হাজির, এবং আড়াই হাজার বছরের মধ্যে ওরাই সম্ভবত প্রথম মানুষ, যারা এখানে পা রাখতে পেরেছে।

এক সময় আবার চলা শুরু হলো। থেকে থেকে বালিতে গাড়ির চাকা দেবে যাওয়া ছাড়া আর যে বড় সমস্যায় পড়ল ওরা, তা হলো দিনের প্রচণ্ড গরম ও রাতের কনকনে শীত। আরও আছে মরু ঝড়। লিবিয়ান মরুভূমিতে গিলবি বলা হয় একে। সবসময় দক্ষিণে উৎপত্তি হয় গিলবির, স্থায়ী হয় বড়জোর চার থেকে পাঁচ মিনিট।

এ সময় ক্যারাভ্যান থামিয়ে কাঁচ তুলে গাড়ির মধ্যে বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। তবু ভেতরে বালি ঢোকে, সূক্ষ্ম সোনার গুঁড়োর মত বালিতে ঢাকা পড়ে যায় সব, নাকেমুখে ঢুকে বিচ্ছিরি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অনেক উঁচু টাওয়ারের মত পাঁচ-ছয়টা বালির স্তম্ভ, তীব্র গতিতে পাক খায়, নেচেকুদে বেড়ায়, তারপর শক্তি হারিয়ে মিলিয়ে যায় একসময়, এই হলো গিলবি। দূরের পাহাড়ে বা উপত্যকায় যখন ঝড় ওঠে, তখন দেখার মত হয় সে দৃশ্য।

সে সময় ঘন কুয়াশার মত ঢাকা পড়ে যায় চারদিক। প্রথমবার যখন শক্ত গিলবির পাল্লায় পড়ে ওরা, সেবারই সবগুলো গাড়ির পেইন্টের কণা পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে ক্ষিপ্ত বালি। ওটা ঠেকানোর উপায় নেই জানা কথা, তাই ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দেয়নি রানা। ওর মূল চিন্তা ছিল এঞ্জিন নিয়ে। ওর মধ্যে বালি ঢুকলে সব শেষ, তাই লাকসরে সবগুলো গাড়ির এঞ্জিন বিশেষ স্যান্ড প্রোটেক্টর দিয়ে মুড়ে নিয়েছিল। চমৎকার কাজ হয়েছে তাতে, এখন পর্যন্ত কোন এঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয়নি।

দিনের পর দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, কনভয় চলছে তো চলছেই। ক্রেস্টের পর ক্রেস্ট, ভ্যালির পর ভ্যালি অতিক্রম করে বাধা না পড়লে দৈনিক চল্লিশ মাইল, পড়লে বিশ-পঁচিশ মাইল, এই গতিতে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। একঘেয়ে নিয়মের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। সকালে নাস্তা খেয়েই চলা শুরু হয়, দুপুরে একটু বিশ্রাম-খাওয়া, তারপর আবার সন্ধে পর্যন্ত চলা। প্রথমদিকে বিকেলে চায়ের বিরতি ছিল আধ ঘণ্টা।

সময়ের কথা ভেবে সেটা তুলে দিয়েছে রানা। গাড়ি একবার ফেঁসে গেলে প্রচুর সময় নষ্ট হয়, তার ওপর এতবার বিরতি দেয়া হলে সবদিক থেকেই ক্ষতি, তাই চা-পর্বের সময় সন্ধেয় বেঁধে দিয়েছে ও। রাতের জন্যে যেখানে ক্যাম্প করা হয়, সেখানে। চায়ের পর রাতের খাবার তৈরি হওয়ার ফাঁকে কিছু সময় পাওয়া যায়, মনোরঞ্জনের কাজে ব্যয় হয় তা।

ক্যাসেট প্লেয়ার বাজিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নাচের আসর বসে তখন। সেন্ট্রি বাদে সবাই অংশ নিতে পারে তাতে। যে সেন্ট্রি একদিন বাদ পড়ে, পরদিন সুযোগ পায় সে। এছাড়া আড্ডা, তাস ইত্যাদিও রয়েছে। ফলে দলের প্রত্যেকের মনোবল এখনও অটুট আছে। বাবার জন্যে প্রথমে কয়েকদিন মনমরা ছিল সিলভি, এখন সে-ও মোটামুটি স্বাভাবিক।

এগারো দিনের দিন গন্তব্যে পৌঁছল ওরা। রানার ধারণা ছিল জায়গামত পৌঁছলে কিছু না কিছু আলামত দেখা যাবে—হয়তো কোনকিছুর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন, অথবা কোন মরুদ্যান। কিন্তু সেরকম কিছুই নেই।

দুপুরের খাওয়া সেরে দিনের দ্বিতীয় যাত্রা শুরুর দু'ঘণ্টা পর গাইডদের থামতে নির্দেশ দিল সিলভি। রানার দিকে ফিরে ঘোষণা করল, 'এই সেই জায়গা।'

একটা মাঝারি উচ্চতার রিজের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল কনভয়। গাড়ি থেকে নামল রানা, চারদিকে যতদূর দেখা যায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কিচ্ছু নেই, সেই একই দৃশ্য—হলদে চাদরমোড়া রিজ আর উপত্যকা আর দীর্ঘ হলদে ঝোপের সারি। সিলভির মাঝদুপুরে নেয়া সূর্যের অবস্থান ও লগারিদমের হিসেব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ও. ঠিকই আছে। কোন ভুল হয়নি সিলভির।

বাতাস থেকে আড়াল পাওয়া যাবে, খুঁজে পেতে আধমাইল দূরে এমন একটা জায়গা বের করে তাঁবু গাড়ার নির্দেশ দিল রানা। তারপর সিলভি, ক্লারিসা ও হ্যারিসহ স্পটে ফিরে এল, ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল জায়গাটা। সবারই আশা কিছু না কিছু চোখে পড়বে, হয়তো এক আধটা তরবারি কি বর্শার ফলা, অথবা আর কিছু। কিন্তু নেই কিছু। মসৃণ বালির সাগর আর ঝোপ ছাড়া।

লিবিয়ান মরুভূমির প্রকৃতির কথা ভাবল রানা। প্রফেসর কার্টারের মুখে শুনেছে, এখানকার ঝোপঝাড় দেখে যদিও মনে হয় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, আসলে কিন্তু তা নয়। প্রতিনিয়ত জায়গা বদল করে ওরা, খুব ধীরগতিতে। উন্মুক্ত বাতাসের চাপে ব্যাপারটা ঘটে। একচুল একচুল করে বাতাসের অনুকূলে সরতে থাকে ওগুলো, সাথে বালির সাগরও।

এভাবে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মূল জায়গা বহু মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরে যায়। একই কারণে উপত্যকাও জায়গা বদল করে। ফলে চাপা পড়া কিছু হয়তো কয়েক শতাব্দী উন্মুক্ত হয়ে পড়ে থাকে, পরে আবার তলিয়ে যায় শত শত ফুট উঁচু রিজের তলায়। ওয়েসিস অভ সিওয়া যাত্রাপথে এখানে যে সেনাদল ছিল, তারা নিশ্চয়ই রাতের হিমশীতল বাতাসের কামড় থেকে বাঁচতে উপত্যকার পায়ের কাছেই ক্যাম্প করেছিল।

তাদের মৃত্যুর কয়েক মাস, অথবা কয়েক বছর পর তার সমস্ত

চিহ্ন মুছে চলমান ঝোপের তলায় পড়ে। তার ওপর জমা হয়েছে বালি, কত শত ফুট উঁচু হয়ে কে জানে! পরে আবার হয়তো কোনদিন উন্মুক্ত হয়েছে সে সব, আবার চাপা পড়েছে। তবে ক্যামবিসিসের ধনভাণ্ডার যে এখানেই আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক কোথায় এবং কত গভীরে?

ওদের কারও জানা নেই। একটা স্বস্তি অবশ্য আছে, তা হলো পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, ঘোড়া ইত্যাদি এক হিসেবে নিঃসন্দেহে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। অন্য হিসেবে আরও বড় হওয়ারই কথা জায়গাটার। কেন না শেষ সময় ওটা কোন সুশৃঙ্খল বাহিনীর ছিল না। ছিল মৃত্যু ভয়ে ভীত একদল আদম সন্তানের, প্রাণ বাঁচাতে পথের খোঁজে পাগলের মত ছোটাছুটি করেছে ওরা, পানির সন্ধানে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়িয়েছে। কাজেই কোন না কোন সূত্র ঠিকই আছে তাদের কোথাও না কোথাও।

হেরু-টেমের কথা ভাবল ও, তার নেয়া বিয়ারিঙের কথা ভাবল। তখনকার দিনে গিজার পিরামিড ছিল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জিরো, হিসেবটা তার ওপরই করেছে সে। অর্থাৎ ধরে নেয়া যায় নির্ভুল ছিল তার হিসেব। কিন্তু ওরা যে হিসেবে এখানে পৌঁছেছে, সেটা ঠিক ছিল তো? তাতে যদি একচুল পরিমাণও এদিক-ওদিক হয়ে থাকে, তাহলে স্পট থেকে বহু মাইল দূরে সরে আসার সমূহ আশঙ্কা আছে।

বর্তমান ক্যাম্পকে স্পটের কেন্দ্র হিসেবে ধরা হবে ঠিক করল রানা, তারপর যতবড় অঞ্চল নিয়ে সম্ভব, সার্চ এরিয়া গাড়ি নিয়ে চক্কর দিতে হবে। পরদিন ভোরে নাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল ওরা দুটো গাড়ি নিয়ে। একটায় রানা-সিলভি, অন্যটায় হ্যারি-ক্লারিসা। হ্যারি অবশ্য তেল খরচের কথা ভেবে সবাই মিলে একটাতে চড়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু রানা তাতে রাজি হয়নি। একসঙ্গে

নয়, দু'দল হয়ে দু'দিকে যেতে হবে। তাতে অল্পসময়ে বেশি জায়গা ঘোরা হবে।

একটা গাড়ি নিয়ে বের হওয়া বিপজ্জজনক বলে মিশর সরকার মরুভূমিতে একসাথে দুটো গাড়ির কমে চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এতে একটা গাড়ি বিকল হয়ে গেলে অন্যটার তার যাত্রীদের উদ্ধার করার সুযোগ থাকে। একটামাত্র গাড়ি হলে সে ক্ষেত্রে কোন আশাই থাকে না আরোহীদের। কাজেই একসঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। তাছাড়া মরুভূমিতে প্রায়ই টহল দেয় সরকারী প্লেন, আইন অমান্যের ঘটনা ওদের চোখে পড়লে সমস্যায় পড়তে হবে।

সময় এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কাজেই দুপুরে খাওয়ার জন্যে ফিরে আসার সময় ও কষ্ট, তেল ইত্যাদি বাঁচাতে লাঞ্চ সঙ্গে নিয়েই বের হবে ঠিক করল রানা। তাতে প্রতিদিন অনেক বেশি জায়গা খুঁজে দেখাও সম্ভব হবে। পরের পাঁচদিন রোজ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গড়ে সত্তর মাইল করে প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল এলাকা নিয়ে চক্কর দিল ওরা, কিন্তু কাজের কাজ হলো না কিছু। কিছুই চোখে পড়ল না কারও। শেষের দিকে রানার ভয় হতে লাগল হয়তো দিক্ নির্ণয়ে গুরুতর কোন ভুল করে বসেছে ওরা, ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

ওয়েসিস অভ দাখলা থেকে সঙ্গে দুটো পানির লরি এনেছে রানা, প্রতিটায় তিনশো গ্যালন করে পানি আছে। যদিও আরও অনেক বেশি পানি ধরে, তবু মরুভূমিতে ওগুলোর স্বচ্ছন্দে চলার সুবিধের কথা ভেবে বোঝা আর বাড়ায়নি রানা। প্রয়োজন হবে মনে করেনি। ধরে রেখেছিল, ছয়শো গ্যালন পানি থেকে দলের সবার জন্যে রোজ মাথাপিছু এক গ্যালন করে খরচ হলেও মোট একমাস তিনদিন অনায়াসে চলে যাবে।

তার দশদিন যাবে দাখলা থেকে স্পটে পৌঁছতে এবং দশদিন ফিরে যেতে। বাকি প্রায় দুই সপ্তাহ খরচ হবে আসল কাজে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হিসেব ঠিক থাকেনি। নিরাপত্তার জন্যে দলের সদস্য সংখ্যা পথে কয়েকজন বাড়াতে হয়েছে করিমের পরামর্শে। তাদের সংগ্রহ করে যাত্রা আরম্ভ করতে বাড়তি সময় লেগেছে, তাছাড়া স্পটে পৌঁছতেও একদিন বেশি লেগে গেছে। অতএব পৌঁছেই নতুন করে হিসেব কষে দেখেছে রানা, দু'সপ্তাহ নয়, বড়জোর দশদিন সময় পাচ্ছে ওরা কাজ সারার। তার থেকে এরমধ্যেই পাঁচদিন শেষ, অথচ ফলাফল শূন্য। আর আছে পাঁচদিন।

এরমধ্যে যদি সাফল্য না আসে, তাহলে বাধ্য হয়েই খালি হাতে ফিরতে হবে। পানি খরচের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে হয়তো আরও দুয়েকদিন বেশি থাকা যাবে, এর বেশি কিছু করার উপায় নেই। আর যদি এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যায়, ফিরতি যাত্রা করতে দেরি হয়ে যায়, তাহলে কঠিন সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

হয়তো দাখলা নয়, কাছের ওয়েসিস অভ সিওয়া যাওয়ার কথা ভাবতে হতে পারে তখন নিরুপায় হয়ে। সিওয়ার দূরত্ব আশি মাইল, তিন কি চারদিনে ওখানে পৌঁছানো সম্ভব। সেই হিসেবে এখানে অবস্থানের সময় আরও কয়েকদিন বাড়ালেও সমস্যা ছিল না। কিন্তু মুশকিল হলো ওখানকার সেনাসি আরবরা বিদেশীদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ কলামের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল ওরা। এখনও সে মনোভাব বদলায়নি, বরং আরও কঠোর হয়েছে। ইওরোপীয়দের; বিশেষ করে ব্রিটিশদের ওই শহরে পা রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জায়গাটা মিশরের অংশ হলেও সেনাসিরা একরকম স্বাধীন

জাতিই বলা চলে। কেন্দ্রের কোন মাতব্বরী মানে না, নিজেদের গড়া আইনে চলে। ঝামেলা এড়াতে মিশর সরকারও ঘাঁটায় না ওদের। স্থানীয় এক শেখের শাসনে চলে সিওয়া, তার উপাধী লর্ড অভ দ্য ওয়েসিস–মরুদ্যানের অধিপতি।

ভেবেচিন্তে ঠিক করল রানা, ফলাফল যা-ই হোক, পাঁচদিন বা বড়জোর ছয়দিন এখানে থাকবে ওরা, তারপর ফিরতি পথ ধরবে। যদিও অন্যরা, বিশেষ করে সিলভি মেনে নিতে চাইবে না, আপত্তি করবে। তা ও করতেই পারে। কারণ এই অভিযানের সাফল্যের সাথে ওর অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। এ কাজে কারিসার যে টাকা খরচ হয়েছে, তুলনামূলক ভাবে তা খুবই সামান্য। রানার নিজের ব্যাপার অনেকটা 'হলে ভাল, না হলে নেই' ধরনের।

কিন্তু সিলভির তা নয়। প্রথমে রানা বুঝতে পারেনি ওদের আর্থিক অবস্থা কতখানি খারাপ, বুঝেছে কায়রো এসে। বলতে গেলে কিছুই নেই এখন সিলভির। ক্যামবিসিসের নিরুদ্দেশ ধন-রত্নের খোঁজে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন প্রফেসর কার্টার, যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সবই এর পিছনে খরচ করে ফেলেছেন সুদিনের আশায়। কাজেই জীবন ধারণের জন্যে সফল হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই সিলভির, অতএব আপত্তি ও করবেই।

কি করা যায়? ভাবতে লাগল রানা। অনেকক্ষণ পরও যখন কোন সমাধান পেল না, তখন বিরক্ত হয়ে ক্ষান্ত দিল। আরও তো পাঁচ দিন সময় হাতে আছে, ভাবল ও, এখনই এত মাথা গরম করার দরকার কি? দেখাই যাক্ না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ও যতই দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, ততই জেঁকে বসে চিন্তাটা। কেন না এরকম মানসিক অবস্থায় মেয়েটা নতুন কোন কষ্ট পাক, ও তা চায় না।

মাথাপিছু পানি খরচের পরিমাণ আরেকটু কমিয়ে দিলে

কেমন হয়? চিন্তাটা হঠাৎ করে মাথায় এল ওর। মরুভূমিতে এক গ্যালন পানি একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে না? স্থানীয়রা পনেরো দিনেও একদিন গোসল করে না, এটা একটা সুখের কথা। কিন্তু রান্নার সময় ব্যাটারা পানি খরচ করে বেশি। প্রায় অকাজেই অনেক পানি খরচ করে ফেলে।

আজ থেকে ব্যাপারটা বন্ধ করতে হবে। টাইট রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তাতে কিছু পানি বাঁচবে। এ ছাড়া সবক'টা গাড়ির রেডিয়েটরে যে পরিমাণ পানি আছে, তার পরিমাণও কম নয়। বিশুদ্ধ পানি, অতএব রান্না-খাওয়া সব কাজেই তা ব্যবহার করা যাবে প্রয়োজনে। তা হলে টেনেটুনে হয়তো আটদিন চালানো যাবে। যথেষ্ট! ভেবে খুশি হলো ও। এরমধ্যে সাফল্য নিশ্চয়ই আসবে।

গাড়িগুলোর ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে ঠিক করল রানা, বিশেষ করে যে দুটো কার নিয়ে রোজ সার্চে বের হয় ওরা। যদি কোনটা গড়বড় করে, তাহলে সর্বনাশ। যদিও তেমন আশঙ্কা কম। রোজ সকালে বের হওয়ার আগে দুটোরই এঞ্জিন খুব ভাল করে চেক করা হয়। মূল সমস্যা হলো বালিতে গাড়ি বসে যাওয়া। তেমন কিছু ঘটলে দু'জনের পক্ষে গাড়ি তোলা সম্ভব হবে না। অবশ্য সে আশঙ্কা একেবারেই নেই বলা চলে।

একে ওগুলো লরির তুলনায় যথেষ্ট হালকা, তারওপর টায়ার চওড়া বেলুনের মত, কাজেই গেড়ে অন্তত বসবে না। তাছাড়া এতদিন মরুভূমিতে গাড়ি চালিয়ে বালি চিনে ফেলেছে ওরা, কোথায় ফেঁসে যাওয়ার চান্স আছে, কোথায় নেই, বালির রং দেখলে বুঝতে পারে।

তারপরও তেমন কিছু যদি ঘটেই যায়, যদি কখনও গাড়ির আশা ছেড়ে পাঁয়ে হেঁটেই ক্যাম্পে ফিরতে হয়, তবু বিশেষ সমস্যা

হবে না। গাড়ির ট্র্যাক ধরে ফিরবে।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে, প্রায়-সময়ই ঘটে তার উল্টোটা।

ওদের বেলায়ও ঘটল।

নয়

পরদিন সকালে আবার শুরু হলো অনুসন্ধান। আজ রানা ও ক্লারিসা উঠল এক গাড়িতে, অন্যটায় হ্যারি ও সিলভি। ক্যাম্পের চারদিকের পনেরো মাইল এলাকা এরমধ্যে খুঁজে দেখেছে ওরা, আজ তার বাইরে কাজ করবে।

নির্দিষ্ট করে রাখা সীমানায় পৌঁছে গাড়ি থেকে নামল রানা, মাথায় কাপড় বাঁধা ফুট দশেক লম্বা একটা পোল গাঁথল মাটিতে। বিকেল চারটেয় পোলের গোড়ায় মিলিত হবে দু'দল। একটু পর বালি উড়িয়ে দু'দিকে ছুটল দুই গাড়ি। সঙ্গী হিসেবে ক্লারিসা মেয়েটাকে মন্দ লাগল না রানার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একঘেয়ে, ক্লান্তিকর অনুসন্ধানের পুরোটা সময় স্বভাবসুলভ হাশিখুশিই থাকল ও, মুহূর্তের জন্যেও হতাশ হতে দেখা গেল না।

দিনের শেষে দেখা গেল রানা মনে মনে যে ভয় করেছিল, তাই সত্যি হলো। মাটি হলো দিনটা। চারটের খানিক পর পোলের গোড়ায় পৌঁছে হতাশা আরও বাড়ল ওর। হ্যারি-সিলভি আগেই পৌঁছেছে ওখানে, ওরাও ব্যর্থ। পরদিন আবার বের হলো। এবার রানা-সিলভি একসাথে। আগের দিনের মত দু'দিকে চলল

দুই দল।

আজ একটু বেশি দক্ষিণের পথে এগোল রানা। দুপুর পর্যন্ত সেই ক্লান্তিকর অনুসন্ধান চলল, ক্যামবিসিসের সেনাবাহিনীর অবস্থানের পাত্তাই নেই। পাহাড় আর উপত্যকা, উপত্যকা আর পাহাড় চষে বেড়াতে লাগল ওরা ধীরগতিতে। সামনে, দু'দিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল দু'চোখ চারদিকে চকচকে বালি দেখতে দেখতে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল দৃষ্টিশক্তি, তবু দৃশ্যপটের একচুল পরিবর্তন ঘটল না।

লাঞ্চের জন্যে পনেরো মিনিট বিরতি দিয়ে আবার চক্কর শুরু করল রানা, এবং দশ মিনিট যেতে না যেতে ভাগ্য প্রসন্ন হলো। এক পাহাড়ের সামান্য ঢালু কিনারা বেয়ে ড্রাইভ করছে ও নিচের উপত্যকায় পৌঁছার জন্যে, সামনে চোখে পড়ার মত কিছু নেই। বড় এক ঝোপের পাশ কাটাতে ডানদিকের চাকা একটা ছোট গর্তে নামিয়ে দিল রানা গতি না কমিয়ে, তখনই লাগল আঘাতটা।

কিছু একটার সাথে দড়াম করে বাড়ি খেল সামনের টায়ার, গাড়ি বাঁদিকে কাত হয়ে চলছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে সেদিকটা শূন্যে উঠে গেল। তারপর ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই উল্টে গেল গাড়ি, দুটো ডিগবাজি খেয়ে নরম বালি চিত হয়ে থেমে পড়ল। এখানে-ওখানে ঘা-গুঁতো খেয়ে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল রানা। মাথার একপাশ কেটে রক্ত গড়াচ্ছে।

নিজের ব্যথা ভুলে জানালা গলে দ্রুত চার হাত-পায়ে বেরিয়ে এল ও, টেনেটুনে বের করল সিলভিকে। গাড়ি উল্টে পড়ার সময় ওকে দু'তিনবার চেঁচিয়ে উঠতে শুনেছিল ও; এখন গোঙাচ্ছে। আঘাত কোথায় লেগেছে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল ডান পায়ের কব্জি মচকে গেছে কেবল, মারাত্মক কিছু হয়নি।

একটু সামলে নিয়ে পরিস্থিতির ওপর চোখ বোলাল রানা। সুবিধের নয় দেখে দমে গেল মন। ওদের দু'জনের পক্ষে খালি হাতে গাড়ি সোজা করা অসম্ভব। চারদিকে এমন কোন গাছ দেখা গেল না যার ডাল ভেঙে তা দিয়ে ওটাকে খাড়া করার কোন ব্যবস্থা করা যায়। কাজেই গাড়ির আশা বাদ। এদিকে ওরা যেখানে রয়েছে, সে জায়গা ওদের আজকের চক্করের একেবারে শেষ প্রান্তে। অর্থাৎ ক্যাম্প থেকে মোটামুটি ত্রিশ মাইল দূরে, এবং ফ্ল্যাগ পোল থেকে বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

পরেরটা খুব বেশি দূরে নয়, টায়ারের ট্র্যাক ধরে দ্রুত পা চালালে চারটের দিকে না হোক, অন্তত সূর্যাস্তের আগে পৌঁছানো যেত কষ্টেসৃষ্টে হয়তো। কিন্তু সিলভির পা মচকে যাওয়ায় সেটাও এখন সম্ভব নয়। ভালই লেগেছে ওর, থেকে থেকে গোঙাচ্ছে এখনও। ঠিকমত ভরই দিতে পারছে না ডান পায়ে।

ক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। একেবারে অমূলক নয় ওর উদ্বেগ। জানে, ওদের পৌঁছতে দেরি দেখলে একসময় না একসময় হ্যারি ও ক্ল্যারিসা ওদের খুঁজতে বের হবে। কিন্তু কতক্ষণে? ট্র্যাক অনুসরণ করে এই জায়গায় পৌঁছতে কম করেও তিন ঘণ্টা লাগবে ওদের। যদি রওনা করতে দেরি করে, তাহলে পথে রাত হয়ে যাবে, তখন আরও বেশি সময় লাগবে। ক্যাম্পে ফিরতে ফিরতে হয়তো ভোর হয়ে যাবে। কিন্তু এরমধ্যে যদি...দুত্তোর!

বিরক্ত হয়ে চিন্তা-ভাবনার গাড়ি থামাল ও। ওদিকে সিলভি বুঝতে পেরেছে কি চিন্তা চলছে রানার মাথায়। আর যা-ই হোক, জীবনের বেশিরভাগ সময় বাবার সাথে মরুভূমিতে কেটেছে ওর, এখানকার বিপদ-আপদ সম্পর্কে ভালই জানে। তাই নিজেই প্রস্তাব দিল বসে বসে সময় নষ্ট না করে হেঁটে ফেরার চেষ্টা করার। যতদূর সম্ভব এগিয়ে থাকার। নইলে বাই চান্স যদি ঝড় ওঠে,

সর্বনাশ ঘটে যাবে। মুছে একাকার হয়ে যাবে ট্র্যাক।

রানাও এই ভয়টাই করছিল, কিন্তু এই অবস্থায় ওকে হাঁটতে বলা কেমন হবে ভেবে বলতে পারছিল না। 'তুমি হাঁটতে পারবে?' কিছু সময় ইতস্তত করে বলল ও।

'পারব,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল সিলভি।

'দেখে তো মনে হয় না।'

'ওঠো তো! খুব পারব, দেখোই না। কষ্ট হলেও হাঁটতে হবে,' বলে মৃদু হাসল। 'না পারলেই কি? তুমি তো রয়েছ, কোলে করে নিয়ে যাবে!'

চোখ কপালে উঠল রানার। 'ভালই বলেছ। এমন এক নাদুস-নুদুস, খাসা মেয়েছেলেকে কোলে তুলে নিলে কল্পনায় যে সব ছবি ভাসবে চোখের সামনে, তাতে...'

'হয়েছে!' ধমকে উঠল সিলভি। দু'গালে লালের আভা দেখা দিল। 'যতসব নোংরা কথা!'

নিরীহ ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'দুনিয়াটাই এমনি। সত্যি বললে রেগে ওঠে মানুষ। যাক্‌গে, চলো তাহলে। দেখি তোমার দৌড় কত।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা। এক হাতে রানার কাঁধ জড়িয়ে ধরে হাঁটছে সিলভি। সাহায্য করার জন্যে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে রানা, হাতের টানে যতটা সম্ভব ওপরমুখো করে রেখেছে ওর দেহের ভার। অবশ্য এক হাতে বেশিক্ষণ তা সম্ভব হচ্ছে না বলে খানিক পরপর পাশ বদল করতে হচ্ছে ওকে। একবার ডান হাতে ধরছে; একবার বাঁ হাতে। তারপরও একসময় সহ্যের বাইরে চলে গেল ব্যাপারটা। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ও প্রায় একশো পাউন্ড ওজনের একজনকে ওভাবে হাঁটতে সাহায্য করা সত্যিই কঠিন।

ব্যথায় টন্‌টন্‌ করতে লাগল দু'হাতের পেশী, তবু হাল ছাড়ল না ও। অসাধারণ মানসিক শক্তি খাটিয়ে কিছুটা হাতের টানে, বাকিটা নিতম্বের পাশ দিয়ে ঠেলে গুঁতিয়ে নিয়ে চলল মেয়েটিকে। যত কষ্টই হোক, এভাবে দু'মাইল পথ পেরিয়ে এল ওরা। তারপর আচমকা হাল ছেড়ে দিল সিলভি, কেঁদে উঠল শব্দ করে। আর এক পা-ও হাঁটা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসল রানা। কষ্ট পেল সঙ্গিনীর যন্ত্রণায় নীল হয়ে ওঠা চেহারা দেখে। চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, 'আরও আগে কেন বলোনি?'

জবাব দিল না সিলভি। কিন্তু রানার তা বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না। ওর ভার বইতে কষ্ট হবে রানার, তাই মুখ বুজে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে গেছে। বুঝতে দিতে চায়নি। অসহ্য না হয়ে উঠলে আরও কতদূর যেত কে জানে! কিন্তু কাজটা ভাল করেনি ও, এর ফলে স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারত। এরমধ্যে হয়ে গেছে কি না তারই বা ঠিক কি?

মিনিট দশেক বিশ্রামের ফাঁকে সমানে সিলভিকে বকাঝকা করল রানা, তারপর সন্তুষ্ট মনে উঠল ওর ভূত ভাগানো গেছে ভেবে। 'ওঠো। আমার কোলে চড়ে যেতে চেয়েছিলে না? এবার তাই যেতে হবে। ইয়ে কোথাকার!'

কোলে নয়, কাঁধে তুলে নিল ওকে রানা। যুদ্ধে আহত সৈনিককে যেভাবে কাঁধে নেয়া হয়, সেভাবে। দুটো বাজে তখন। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই সিলভির নাক টানা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। 'কি হলো?'

'রানা, নামাও আমাকে!' আতঙ্কিত গলায় বলল মেয়েটি। 'জলদি! সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

ছাঁৎ করে উঠল ওর বুকের মধ্যে। 'কি...!'

'বাতাস, টের পাচ্ছ না?' এক পায়ে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল সিলভি। চেহারা একদম ফ্যাকাসে। ঠোঁট কাঁপছে। 'গরম…গিলবি আসছে। ঝড়!'

ওর নজর অনুসরণ করে দক্ষিণে তাকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে আত্মা উড়ে যাওয়ার দশা হলো। চর্কির মত পাক্‌ খেতে থাকা ধুলোবালিতে আঁধার হয়ে গেছে ওদিকটা, আরও ধুলোবালি ও জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে এদিকেই আসছে আঁকাবাঁকা বেখা ধরে। দেখতে না দেখতে এসে পড়ল। পরিধেয় দিয়ে কোনমতে মুখ-মাথা ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা, পরস্পরকে ধরে রেখেছে শক্ত করে।

শুনতে পাচ্ছে মাথার ওপর গোঁ গোঁ করে চক্কর খাচ্ছে তপ্ত বাতাস, এদিক-ওদিক করছে ঘনঘন। আহত, হিংস্র জন্তুর মত। যেন কাকে মারবে কাকে ধরবে বুঝে উঠতে পারছে না। একেবারে রাতের মত অন্ধকার হয়ে এল ধরণী। অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না ঝড়, মিনিট তিনেক পর কমতে শুরু করল বাতাসের বেগ। ওদের কাছ থেকে সরে গেল দূরে।

ভয়ে ভয়ে উঠে বসল ওরা। সামনে তাকিয়ে দেখল সম্পূর্ণ মুছে গেছে ওদের জীবন রেখা, ট্র্যাকের সমস্ত চিহ্ন নেই হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল দু'জনে। আর এক পা যাওয়ারও উপায় নেই, হ্যারিও আর কোনদিন খুঁজে পাবে না ওদেরকে। শুধু তা-ই নয়, এই ঝড়ে ওরাও যদি পড়ে থাকে, তাহলে এখন ওদের দশাও এক। কোনদিকে যাওয়ার পথ নেই।

বোকার মত পরস্পরের দিকে তাকাল রানা ও সিলভি। কথা বেরোল না কারও মুখ দিয়ে। দু'জনেই জানে এখন একমাত্র কোন অলৌকিক শক্তিই পারে ওদের বাঁচাতে, নইলে চব্বিশশো বছর আগে ক্যামবিসিসের সেনাবাহিনীর যে পরিণতি হয়েছিল, ওদের

ভাগ্যেও তাই ঘটবে। লাঞ্চ হিসেবে যা আনা হয়েছে, তা প্রায় শেষ। খানিকটা পানি অবশ্য আছে, শেষ হয়ে গেলেই...

সিলভির ওপর চোখ পড়তে কিছুটা অবাক হলো ও। গিলবি আসছে জেনে যে একটু আগে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, এ মুহূর্তে একদম নির্ভীক দেখাচ্ছে তাকে। চোখাচোখি হতে হাসল সিলভি। 'আমি জানি তুমি কি ভাবছ।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কি?'

'ভাবছ, যখন কোন উপায় থাকবে না, তখন আগে আমাকে গুলি করে মারবে তুমি, তারপর নিজেকে...'

'আরে না!' হেসে উড়িয়ে দিতে গেল রানা, কিন্তু জমল না অভিনয়। 'আমি ভাবছি গাড়িতে পানির রিজার্ভ আছে আমাদের, কোনমতে ওখানে ফিরে যেতে পারলে আর চিন্তার কিছু থাকবে না। হ্যারি না পৌঁছানো পর্যন্ত নিশ্চিন্তে...' মেয়েটিকে মাথা দোলাতে দেখে আবার থেমে গেল।

'তা জানি। কিন্তু তুমি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করো গাড়ির কাছে কোনদিন যেতে পারব আমরা? মনে হয় না। কিভাবে ফিরব? কোন পথে? চারদিকের এত ঝোপঝাড়ের যন্ত্রণায় আধ মাইলের বেশি দেখা যায় না, কাজেই হ্যারি আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে বলেও মনে হয় না। তার মানে কোন আশা নেই আমাদের, সব শেষ।'

'আমার তা মনে হয় না,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল রানা। 'দেখো, শেষ পর্যন্ত ঠিকই উদ্ধার পেয়ে যাব আমরা।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন করল সিলভি।

'জানি না। তবে আমার মন বলছে বিপদ ঠিকই কাটিয়ে উঠতে পারব আমরা। কাজেই হতাশ হওয়ার এখনই কিছু দেখছি না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটি। রানার আস্থা ওর মধ্যেও সংক্রমিত হলো একটু একটু করে, কিন্তু তার ওপর বেশি ভরসা করার সাহস হলো না। আনমনে গোড়ালিতে হাত বোলাতে বোলাতে উদাস গলায় বলল, 'কি জানি!'

আগুনের গোলার মত সূর্যটা ডুব দিল যথাসময়। গোধূলির বিস্ময়কর রঙের আসর বসল যেন পশ্চিম দিগন্তে, মরুভূমির এ এক অবিশ্বাস্য বিচিত্র রূপ। নানা রঙের খেলা দেখিয়ে একসময় বিদেয় নিল আলো, গাঢ় আঁধার ঘনিয়ে এল। এত আঁধার যে চোখের সামনে হাত তুলেও দেখা যায় না। একটা একটা করে তারা ফুটতে শুরু করল খানিক পর, ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশে নতুন রঙের মেলা বসে গেল। স্বর্গীয় আভায় মিটিমিটি হাসতে লাগল ওয়েসিস অভ জুপিটার—আম্মন।

সামান্য যেটুকু খাবার ছিল, খেয়ে নিল দু'জনে। তারপর ঘুমাবার আয়োজনে লেগে পড়ল রানা। একটু পরেই হাড় কাঁপানো শীত পড়বে, অথচ সঙ্গে গরম কাপড় নেই। অতএব বাঁচার জন্যে বালিতে ছয় ফুট দীর্ঘ, আঠারো ইঞ্চি চওড়া ও এক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ল ও। সিলভির উদ্দেশে বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো এর মধ্যে। দু'পা হাঁটু পর্যন্ত বালু দিয়ে ঢেকে নাও, ঠাণ্ডা কম লাগবে। আমি আরেকটা গর্ত খুঁড়ে নিচ্ছি।'

'দু'জন এক গর্তেই থাকতে পারি আমরা,' শান্ত কণ্ঠে মন্তব্য করল মেয়েটি।

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল রানা, দু'জন শুলে শীত অনেক কম লাগবে। গর্তটা আরও চওড়া করে শুয়ে পড়ল দু'জনে। রানার বাহুর ওপর মাথা রেখে গা ঘেঁষে শুলো সিলভি, পরস্পরের উষ্ণতা অনুভব করতে লাগল ওরা। দু'জনের ঊরু পর্যন্ত বালি দিয়ে ঢেকে নিয়েছে রানা, ভালই ফল হয়েছে তাতে, নিচের

অংশে শীত একেবারেই করছে না।

ঘুম আসছে না রানার। নীরবে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। মন জুড়ে বাঁচার চিন্তা। এই বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। সিলভি অনড়, দম নিচ্ছে গভীর। ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। ওর কথা ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বেচারী! বাপের পছন্দের লাইনে লেখাপড়া এবং তাঁর সঙ্গে খোঁড়াখুঁড়ি করেই জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটে গেল, আর দশটা ইওরোপীয় মেয়ের মত সামাজিক জীবন বলে কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার সুযোগই পায়নি। নিজেদের টাকা-পয়সা যা ছিল, সব গেছে খোঁড়াখুঁড়ির পিছনে, সাধারণ শখ-আহ্লাদ পূরণেরও সুযোগ জোটেনি কখনও।

সেজন্যে অবশ্য কোন আফসোস ছিল না সিলভির, ভবিষ্যতের সুদিনের আশায় বুক বেঁধে ছিল। এমন সময় শয়তান শের খান ও হাবিব বে-র সর্বগ্রাসী লোভের শিকার হয়ে মরতে হলো ওর বাবাকে। নিজেও কম হেনস্তা হয়নি ওদের হাতে, তবু আশাহত হয়নি রানার সাহায্য পাবে বলে। মনে জোর ছিল যত কঠিন বিপদই আসুক, ও থাকতে ভয়ের কিছু নেই। সমস্যা ঠিকই কেটে যাবে।

এখন বোধহয় সেটুকুও গেছে। ওর মত মাসুদ রানাও বিপদগ্রস্ত এখন। এমন বিপদ, যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশা একেবারে নেই বললেই চলে। মরুভূমি সম্পর্কে সিলভির অভিজ্ঞতা রানার তুলনায় অনেক বেশি, কাজেই ও যতই জোর দিয়ে বলুক সমস্যা কেটে যাবে, ভরসা নিশ্চয়ই করতে পারছে না।

পাশে তাকাল রানা, আবছা আলোয় ওকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ফ্যাকাসে, ক্লান্ত দেখাচ্ছে চেহারা। চোখ ফিরিয়ে

নিতে যাচ্ছিল ও, তখনই চোখ মেলল সিলভি। মিষ্টি করে হাসল। 'কি দেখছ?'

'কিছু না, এমনি!' ধরা পড়ে বিব্রত বোধ করল রানা।

'মিথ্যে বললে, আমি এবারও বলে দিতে পারি কি ভাবছিলে তুমি,' মৃদু গলায় বলল সিলভি।

'থট্ রীডিং শিখেছ মনে হচ্ছে?'

ঝিলিক মেরে উঠল মেয়েটার ঝকঝকে দাঁত, নিঃশব্দে হাসছে। 'তা বলতে পারো। যদিও এ ব্যাপারে কোন অ্যাকাডেমিক শিক্ষা পাইনি আমি। একটা কথা খেয়াল রেখো, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মনের চোখের ক্ষমতা অনেক বিস্তৃত আর গভীর। তাই ঘনিষ্ঠদের মনের কথা অনেক সময় বুঝতে পারে ওরা।'

'তাই বুঝি?' রানা বলল।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বলো দেখি কি ভাবছিলাম আমি?' চ্যালেঞ্জ ফুটল ওর গলায়।

'ওটা থাক্, বরং জবাবটা শোনো। প্রথমে হতাশ অবশ্যই হয়েছিলাম আমি, কিন্তু এখন অতটা নই। আমি বিশ্বাস করি এই বিপদ কেটে যাবে। আর যা-ই হোক, অন্তত পথ হারিয়ে মরব না আমরা।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কখন জন্মাল এই বিশ্বাস?'

'অনেকক্ষণ আগে, বিপদে পড়ার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর,' মৃদু গলায় বলল সিলভি। 'বিপদে পড়লে প্রথমে সবাই ঘাবড়ে যায়, আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর ভয় পাই না আমি।'

কনুইয়ে ভর রেখে মাথা তুলল মেয়েটি, খুব কাছ থেকে

দেখল রানাকে। 'জোর দিয়ে বলতে পারি, কাল আমাদের উদ্ধারের একটা উপায় ঠিকই বের হয়ে আসবে।' মুখ নামিয়ে আনল ও। 'গুড নাইট কিস্ করো, রানা।'

চুমুটা হালকা করেই খেতে চেয়েছিল রানা, কিন্তু হলো না। মুখ সরাল না সিলভি। ফলে দীর্ঘ আর গভীর হয়ে উঠল। নড়েচড়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল সিলভি।

ভোরে চোখ মেলেই পুব আকাশে আলো দেখতে পেল রানা। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই। সিলভির নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া চারদিকে গভীর নীরবতা। এরকম শব্দহীনতায় অভ্যস্ত নয় বলে রানার মনে হলো ও বধির হয়ে গেছে বুঝি। কিছু না কিছু শব্দ নিশ্চয়ই আছে, ও শুনতে পাচ্ছে না। ওর নড়াচড়ায় একটু পর সিলভিরও ঘুম ভেঙে গেল।

গর্ত ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা। রানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে গাড়ির কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সঙ্গের পানি শেষ হয়ে এসেছে, এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিজার্ভ পানির কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা দরকার। পরে কি হবে সে পরে দেখা যাবে।

সূর্যের অবস্থান দেখে কোনদিকে যেতে হবে, সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেল ও। সিলভির চোট লাগা পা কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে আছে, ব্যথাও আছে একটু একটু, তবে কালকের মত সময়ের সাথে পাল্লা দেয়ার তাড়া আজ নেই বলে কোন সমস্যা হলো না। রানাকে তেমন সাহায্যও করতে হলো না ওকে।

প্রতি সিকি মাইল পর পর থেমে বিশ্রাম নিয়ে ধীরেসুস্থে এগোতে লাগল ওরা। কাল আসার পথে চারটে রিজ পার হয়েছে, কথাটা খেয়াল আছে রানার, কাজেই যখন চতুর্থটার গোড়ায় পৌঁছল, আশা-নিরাশার দোলায় মন দুলে উঠল। সত্যিই কি এত

সহজে জায়গামত পৌঁছতে পেরেছে ওরা? কিন্তু উপত্যকায় পৌঁছে থমকে গেল রানা, গাড়িটার চিহ্ন নেই সামনে কোথাও।

মনে হলো একটু বোধহয় বেশি ডানে সরে এসেছে ওরা, তাই উপত্যকার বাঁ দিক ধরে এগোল এবার রানা। দুশো গজমত যেতে সামনে গাঢ় রঙের কিছু একটা দেখা গেল সামনে, বালির ওপরে মাথা তুলে আছে। দেখতে পাথরের মত মনে হলো রানার। ওপরটা প্রায় গোল।

কাছে গিয়ে জিনিসটা পরখ করে দেখল ওরা। পাথর নয়, অন্য কিছু হবে। হাত বাড়িয়ে তুলতে গেল রানা, আঙুলের চাপে মুড়মুড়ে শুকনো পাতার মত গুঁড়িয়ে গেল। জিনিসটা ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারল কোন এক কালে চামড়ার তৈরি গামলা আকৃতির কিছু একটা ছিল ওটা। ওর হাতের স্পর্শে পাত্রটা প্রায় পুরোটাই গুঁড়ো হয়ে গেছে, আছে শুধু গোড়ার দিকের এক লোহার রিম ও চুড়োর সাথে বসানো সুঁচলো বল্লমের ফলার মত ডগা—ওটাও লোহার।

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে শুরু করল রানার। উত্তেজনায় গলা-বুক শুকিয়ে আসতে লাগল। কি ওটা? সিলভিও যে কিছু একটা সন্দেহ করেছে, তা ওর চেহারা দেখেই বুঝল ও। রিমটা নেড়েচেড়ে দেখছে, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছে। নাকের ফুটো স্ফীত হচ্ছে খানিক পর পর।

রানা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে ভাগ্য ওদেরকে শেষ পর্যন্ত ওদের আরাধ্য গন্তব্যে নিয়ে এসেছে। অবশেষে ক্যামবিসিসের হারিয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর অবস্থানের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই পাত্রই তার প্রমাণ। জিনিসটা আর কিছু নয়, প্রাচীনকালের চামড়ার তৈরি হেলমেট। পারসিয়ান ইনফ্যান্ট্রিম্যানের।

প্রাপ্তির উচ্ছ্বাস, বিস্ময় আর আনন্দ কাটিয়ে উঠে থেমে থেমে

বলল সিলভি, 'কী আশ্চর্য! শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে আছে এই চামড়ার হেলমেট! এ কি করে সম্ভব?'

'হয়তো বালুর তলায় চাপা পড়ে ছিল বলে টিকে গেছে,' রানা মন্তব্য করল। 'খুব সম্ভব কালকের গিলবির কারণে বালু সরে গেছে ওপর থেকে।'

'হ্যাঁ। বোধহয় আমাদের চোখে পড়ার জন্যেই।' খুশিতে ঝলমল করে উঠল মেয়েটার মুখমণ্ডল। 'এসো, চারদিকটা খুঁজে দেখি আর কি কি পাওয়া যায়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখন না। প্রথমে গাড়ি খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, তারপর আর সব।'

খুঁজতে হলো না, গাড়ির খোঁজে যাওয়ার পথে আরও অনেক কিছুই চোখে পড়ল। পথে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বেশিরভাগই হেলমেট, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আছে। এছাড়া আছে বেল্ট, ঢাল, হেলমেটের চুড়ো, বল্লমের ফলা ও গ্রিপ। একটা জেভলিন ও চমৎকার এক বেল্ট-বাক্লও চোখে পড়ল—দুটোই পেতলের। সবই দেখছে রানা, কিন্তু মন নেই এদিকে। ব্যস্ত গাড়ির চিন্তায়।

আধ ঘণ্টারও বেশি সময় পর দূর থেকে ওটার দেখা পেয়ে জোরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। বিশ মিনিট লাগল কাছে পৌঁছতে। প্রথমেই স্টক পরীক্ষায় লাগল রানা। খাবার বলতে আছে গতকালকের পিকনিক লাঞ্চের বেঁচে যাওয়া কিছু টিন ফুড, এক বোতল অরেঞ্জেড, কিছু চকলেট, দুটো ক্যান্ডি বার এবং রিজার্ভ পানি। এই দিয়ে খুব কম করে খেলেও পরশু দুপুরের বেশি চলবে না।

তবু, দুটো দিন তো চলবে, ভাবল রানা। তাই বা কম কিসে? পানি যা আছে তাতে তিন দিন অন্তত চলবে। তারপরও যদি প্রয়োজন পড়ে, গাড়ির রেডিয়েটরের পানি বের করে নেবে। অন্তত

আরও আধ-গ্যালন পানি পাওয়া যাবে ওখান থেকে। তা দিয়ে যদি আরও দু'দিন চালানো যায়, তো আর চিন্তা কি? এর মধ্যে হ্যারি নিশ্চয়ই খুঁজে বের করে ফেলবে ওদের।

অসহায়ের মত গাড়িটার দিকে তাকাল রানা। ইশ্, কোনমতে যদি ওটাকে সোজা করা যেত! বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় হাতের কাছে থাকতেও নিরুপায়ের মত বসে থাকতে হচ্ছে বলে আফসোস হলো ওর।

কিছু টিন ফুড আর চকলেট দিয়ে নাস্তা খেয়ে উঠে পড়ল ওরা। গাড়ি কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল দেখতে হবে। সিলভিকে গাড়ির ছায়ায় বিশ্রাম করতে বলে ও একাই এগোল সেদিকে। জিনিসটা কি হতে পারে সে ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছে মনে। সত্যি কি না তা আগে একাই পরীক্ষা করে দেখতে চায়। গতকালও ওটা দেখেছে রানা, কিন্তু কিছু সন্দেহ করেনি।

জিনিসটা কালো রঙের বড় কিছু একটা। আর যাই হোক, পারশিয়ানদের লুটের সম্পদ নয়, ভাবল রানা। পরীক্ষা করে বুঝল লোহা দিয়ে কিনারা বাঁধানো চামড়ার বড় এক চেস্ট ছিল ওটা। ওপরের অংশ গাড়ির সাথে সংঘর্ষে চুরমার হয়ে গেছে, তারপরও ভেতরে যা আছে, তা গাড়ি উল্টে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল বলেই মনে হলো। বালি সরিয়ে জিনিসটা উন্মুক্ত করল রানা।

প্রাচীন ডিনার-সার্ভিস ওটা, চেস্টের কিনারা পর্যন্ত প্লেট ও বাসন-কোসনে ঠাসা। একটা প্লেট তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল রানা। সোনা বা রুপোর নয়, হালকা লালচে আভার অচেনা কোন ধাতুর তৈরি। এসবের অ্যান্টিক ভ্যালু হয়তো তেমন নেই, তবু উত্তেজনা অনুভব করল রানা, আড়াই হাজার বছর আগে যারা এসব ব্যবহার করে গেছে, তাদের কথা ভাবতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়ল। ফিরে এসে সিলভিকে সুখবরটা দিল ও, গাড়ির বুট

থেকে ধস্তাধস্তি করে একটা বেলচা বের করে বলল, 'এবার চলো। খুঁড়ে দেখি ওখানটায় আর কিছু আছে কি না।'

উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে ওর পিছু নিল মেয়েটি, মুখের হাসি থামতেই চায় না। ওকে ঢাল বেয়ে উঠতে সাহায্য করল রানা, বসিয়ে রেখে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চেস্টের চারদিকে কয়েক ইঞ্চি করে খুঁড়তে অনেক কিছুই পাওয়া গেল, যদিও তার বেশিরভাগই চিনতে পারল না ও। বালির মহাসাগরের প্রতিনিয়ত নড়াচড়ায় নষ্ট হয়ে গেছে।

ওসবের সাথে বের হলো তলোয়ার, বর্শা ও বল্লমের ছোটখাট এক মজুত। প্রায় দু'ঘণ্টা খোঁড়াখুঁড়ির পর আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করল রানা, দেখতে ওটা সেডান চেয়ারের মত। ওপরে চামড়ার ছাউনি, ছাতার মত। সিলভি পরীক্ষা করে মত দিল ওটা পারশিয়ানদের কোন হাই-অফিশিয়ালের চেয়ার হবে। হয়তো অসুস্থ ছিল সে, ওটায় বসিয়ে মানুষ বা ঘোড়ার সাহায্যে তাকে বয়ে আনা হয়েছে।

অনেক কষ্টে অক্ষত রেখে চেয়ারটাকে তার আড়াই হাজার বছরের অন্ধকার সমাধি থেকে আলোয় বের করল রানা, তারপর দু'জনে মিলে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার দিকে। ওটা যার ছিল, তার মমি এখনও ওটায় বসা। এই প্রথম কোন পারশিয়ানের অস্তিত্ব দেখতে পেল ওরা। এর আগে মানুষের একটা হাড়ের কণাও চোখে পড়েনি, কালের অবক্ষয়ে ধুলো হয়ে গেছে সব। এটা হয়নি বালির নিচে ছিল বলে।

দীর্ঘ সময় মমিটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। চেয়ারের হাতলে দু'হাত রেখে বসে আছে, মাথা সামান্য হেলে আছে নিজের ডানদিকে। হয় খুব দুর্বল ছিল মানুষটা, উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না, নয়তো যখন বুঝতে পেরেছে মৃত্যু অবধারিত, তখন ছায়ায়

বসে তাকে বরণ করে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর আবার ওটার চারদিকে খুঁড়তে শুরু করল রানা। কোমর বরাবর পৌঁছতে ওটার মাথাটা আস্তে করে খসে পড়ল ঝাঁকি খেয়ে। পাখির পালকের মত হাল্কা ওটা। এখানে দামী কিছু পাওয়া যেতে পারে ভেবে ধৈর্যের সাথে খুঁড়ে চলল রানা, অবশেষে এক সময় ধৈর্যের পুরস্কার মিলল। অফিসারের চেস্টের মধ্যে পাওয়া গেল খাঁটি সোনার ওপর আনকাট রুবি বসানো চমৎকার এক অলঙ্কার। চোখ ধাঁধানো রং-রূপ তার।

আরেকটু খুঁড়তে মমির পায়ের কাছে দামী পাথর বসানো হাতলওয়ালা একটা খাটো, বাঁকা ফলার তরবারি পাওয়া গেল। পাথরগুলো অবশ্য চিনতে পারল না ওরা। আরও একটা জিনিস ছিল ওখানে–খাঁটি সোনার তৈরি দেবতা ওসিরিসের একটা মূর্তি। প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা, চোখের জায়গায় বসানো আছে একজোড়া খুদে শ্যাফায়ার। এ জিনিস পারশিয়ানদের নয়, প্রাচীন মিশরীয়দের। অর্থাৎ থিবস্ থেকে ক্যামবিসিসের লুট করা মালের অংশ এটা।

মূর্তিটা নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে হাসি প্রায় দুই কানে পৌঁছল সিলভির। বলল, 'সোনার পরিমাণ যা আছে, তারচেয়ে অন্তত চার-পাঁচ গুণ বেশি দামে বিক্রি হবে এটা নিজের পরিচয় আর ঐতিহাসিক পটভূমির জন্যে।'

'যদি করা যেত,' রানা বলল। 'কিন্তু মিশর সরকার তা করবে না, ওরা বর্তমান বাজারদর হিসেবে এ জিনিসের দাম ধরবে।'

'তা ঠিক।'

ওখানটায় আর যা পাওয়া গেল, তার মধ্যে আছে মমির সোনার বেল্ট বাক্‌ল, টিউনিকের সোনা-রুপোর বোতাম, মেডেল, এবং কিছু কাগজের মত পাতলা সোনার পাত। সিলভি জানাল

ওগুলো প্রাচীন মিশরীয় টাকা।

সূর্য তখন একদম মাথার ওপরে উঠে এসেছে। প্রচণ্ড গরমে আর তেষ্টায় তখনকার মত কাজ বন্ধ করল রানা, দামী যা যা পাওয়া গেল, সব নিয়ে ফিরে চলল। লাঞ্চ খেয়ে উল্টে থাকা গাড়ির ছাতের ভেতরদিকে সীটের কুশন ও নিজেদের কোট দিয়ে বিছানা তৈরি করল রানা, তারপর জানালা গলে ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়ল দু'জনে। উদ্ধার করা জিনিসগুলো মাথার কাছে রইল।

বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ একটা এঞ্জিনের শব্দ শুনে চট্ করে চোখ মেলল রানা। হ্যারি! পাশে তাকিয়ে দেখল সিলভিও সদ্য কাঁচা ঘুম ভাঙা লাল চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ওরা, পরক্ষণে যা দেখল, তাতে সমস্ত উচ্ছ্বাস হাওয়ায় উবে গেল। হ্যারির গাড়ির আওয়াজ নয় ওটা, একটা প্লেনের। ওদের সামান্য দূরে ল্যান্ড করেছে ওটা, দৌড় শেষ করে থেমে দাঁড়িয়েছে ষাট-সত্তর গজ দূরে।

ঠিকমত বুঝে উঠতে পারল না রানা ওটা কার হতে পারে, তার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল দুই কারবাইনধারী। বাঁদরের মত লাফ দিয়ে নিচে নেমেই ওদের সই করে অস্ত্র তুলল লোকগুলো।

একটু পর প্লেনের ভেতর থেকে বের হলো আরেকজন—শের মোহাম্মদ খান!

দশ

এরপর দেখা দিল চতুর্থ যাত্রী—গোলগাল, তেলতেলে হাবিব বে। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাকে এ মুহূর্তে। খুব স্বাভাবিক, এখন ব্যাটার খুশি হওয়ারই কথা।

শের খানের পিছন পিছন নেমে এল লোকটা। দুই অস্ত্রধারী নিজেদের মাঝের ব্যবধান বাড়াল, ওদের জন্যে চওড়া করে দিল জায়গা। তাই বলে সতর্কতায় একচুল ঢিল দেয়নি, নজর প্রতিমুহূর্তের জন্যে রানার ওপর সেঁটে আছে।

শের খান প্রথম মুখ খুলল। পাতলা ঠোঁট ফাঁক করে হাসির ভঙ্গি করল লোকটা। 'গুড আফটারনূন, মিস কার্টার। চিনতে পেরেছ আমাকে? ক'দিন আগে ইসমাইলিয়ায় অল্প কিছু সময়ের জন্যে তোমার খাতির যত্নের ব্যবস্থাটা আমিই করেছিলাম। অধমের নাম শের খান।'

কিছু বলল না সিলভি, কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে।

'সেদিন তাড়াহুড়ো করে অন্য কাজে চলে যেতে হয়েছিল বলে বিদায় জানানো হয়নি তোমাকে,' আবার বলল শের খান। 'সে জন্যে কিছু মনে করোনি তো?'

জানত জবাব পাবে না, তাই সে জন্যে অপেক্ষাও করল না লোকটা। ঘুরে রানার দিকে তাকাল। কুর্নিশের ভঙ্গি করে বলল,

'মিস্টার মাসুদ রানা! আবার তাহলে দেখা হলো আমাদের! পৃথিবীটা আমাদের মত মানুষের জন্যে সত্যিই খুব ছোট হয়ে গেছে, কি বলেন? সেদিন হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে গোলাগুলির সময় আপনাকে চেনা চেনা লেগেছিল আমার, কিন্তু নকল দাড়ির জন্যে বুঝে উঠতে পারিনি ওটা আপনিই ছিলেন। আফসোস!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সেদিন তোমার খুলি গুঁড়ো করে দেয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পরে আমারও খুব আফসোস হয়েছিল, শের খান। পরেরবার তা হবে না, যদি সুযোগ আসে।'

শব্দ করে হেসে উঠল পাকিস্তানী। 'এখনও সে দুরাশা কর তাহলে?' একদিকের ভুরু উঁচু হলো তার। 'এই অবস্থায়?' ইঙ্গিতে ওদের উল্টে পড়া গাড়ি ও নিজেদের সঙ্গী দুই অস্ত্রধারীকে দেখাল। 'নাহ, তোমার মনের জোরের প্রশংসা করতেই হয়।' আবার হেসে উঠল সে। হাবিব বে-ও যোগ দিল তার সাথে, বড়সড় কুমড়ো সাইজের ভুঁড়ি দুলিয়ে প্রায় নিঃশব্দে হাসতে থাকল।

'যাকগে, আমাদের জন্যে ক্যামবিসিসের হারানো সেনাবাহিনীর লোকেশন খুঁজে বের করে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ। ওখানটায় একটা গর্ত দেখতে পাচ্ছি, কি পেলে ওখানে?'

লুকনোর চেষ্টা অর্থহীন, তাই সে চেষ্টা করল না রানা। মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমার খাঁই মেটাবার মত কিছু নয়। ইচ্ছে হলে দেখে যেতে পারো।'

'দেখব, পরে,' বলে দু'পা এগোল শের খান। 'আগে বলো কখন থেকে আটকা পড়ে আছ এখানে? গাড়ি ওল্টাল কবে?'

'আজই,' রানা বলল। 'ঘণ্টা তিনেক আগে।'

'তোমাদের দু'জনের চেহারা কিন্তু অন্য কথা বলছে,' হাবিব বে বলে উঠল। 'দেখা যাচ্ছে আজ শেভ করার সুযোগ হয়নি তোমার, তাছাড়া মিস কার্টারের চেহারা-সুরতেও আজ কোন চার্ম

চোখে পড়ছে না। এ নিশ্চই খোলা জায়গায় রাত কাটানোর ফল, কি বল?'

'তোমার সঙ্গীরা কোথায়?' ওর জবাবের অপেক্ষায় না থেকে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল শের খান।

'কাছেই আছে। আমরা...' লোকটার মুখে বাঁকা হাসি দেখে থেমে গেল রানা।

'আরেকটা মিথ্যে কথা বললে। তুমি ভুলে গেছ আমরা প্লেনে এসেছি? কাছেপিঠে পাঁচ দশ মাইলের মধ্যে আর কেউ যদি থাকত, আমাদের নজরে অবশ্যই পড়ত। যাক্, এবার দেখি কি কি উদ্ধার করলে গর্ত থেকে।'

বাঁ দিকের অস্ত্রধারীর দিকে তাকাল খান। 'দাউদ, সার্চ করে দেখো কারও কাছে অস্ত্র-টস্ত্র পাও কি না। আমার বিশ্বাস আমাদেরকে ঠিক পছন্দ নয় ওদের। যাও।'

কারবাইন কাঁধে ঝুলিয়ে কোমর থেকে অটোম্যাটিক পিস্তল বের করল লোকটা। পেশীবহুল, প্রকাণ্ডদেহী আরব। ঘুরে ওদের পিছনে চলে এল সে, এক হাতে চাপড়ে প্রথমে রানাকে সার্চ করল, তারপর সিলভিকে। মাথা নাড়ল খানের উদ্দেশে—নেই।

'গুড!' সন্তুষ্টি ফুটল লোকটার চেহারায়। হাবিব বে-কে নিচু গলায় কি যেন বলল, একযোগে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল দু'জনে। পরেরজনের ইঙ্গিতে রানাকে বাহু ধরে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল দাউদ, সিলভি সরল নিজের থেকে। কাছে গিয়ে গাড়ির ভেতরে উঁকি দিল শের খান, বের করে আনল জিনিসগুলো।

ওসিরিসের মূর্তিটা দেখেই চেহারা আমূল বদলে গেল তার। গভীর আগ্রহ নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল ওটা। চেহারায় সীমাহীন কৌতূহল। হাবিব বে-ও আগ্রহী হলো, তবে খানের

সিকিভাগও নয়। অ্যান্টিকের প্রতি কার কতখানি আগ্রহ, এ মুহূর্তে ওদের দু'জনকে দেখলে একটা শিশুও বলে দিতে পারবে।

খানকে একেবারে আমূল বদলে যেতে দেখে অবাকই হলো রানা। হাবিব বে অল্পক্ষণেই ধৈর্য হারালেও খানের চোখের আশ যেন মিটছে না। দেখছে তো দেখছেই। দীর্ঘ সময় পর মুখ তুলল লোকটা, নাকে ঝোলানো হাতলবিহীন চশমার কাঁচের পিছনে চিক্ চিক করে উঠল ধূসর দু'চোখ।

'চমৎকার!' ঘোর লাগা গলায় বলল সে। 'সত্যি চমৎকার! কষ্ট করে এসব উদ্ধার করার জন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। কিন্তু এগুলো এখানে নয়, আমাদের প্লেনে নিরাপদে থাকবে।'

দ্বিতীয় গার্ডের হাতে ওগুলো সব তুলে দিল শের খান, সঙ্গে ওদের সেক্সট্যান্টও। 'এটাও থাকুক আমাদের কাছে। এটা দিয়ে এখানকার একজ্যাক্ট ল্যাটিচিউড জেনে নিতে আমাদের সুবিধে হবে।'

'এখানে কি করে পৌঁছলে তুমি?' কর্কশ গলায় বলল রানা। 'লোকেশন চিনলে কি করে?'

'খুব সহজে,' হাসল শের খান। 'প্রফেসরের ট্যাবলেটের খণ্ডটার কিছু ছবি তুলে রেখেছিলাম বুদ্ধি করে। ওটার হায়রোগ্লিফিক লেখা অনুবাদ করে লোকেশন জেনেছি। এ দেশে আসার পর থেকে তোমার তৎপরতা দেখে সন্দেহ হয়েছিল আমার, তাই ভাবলাম ওটার কিছু ছবি তুলে রাখি। কাজে আসতে পারে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আমার সন্দেহই সত্যি হলো, চোরের ওপর বাটপাড়ি করে ওটা হাতিয়ে নিলে তুমি।' গার্ডের দিকে ফিরল সে। 'রেখে এসো সব।'

লোকটার দিকে এক পা এগোল সিলভি, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ।

উত্তেজিত গলায় বলল, 'কি মতলব তোমার? সেক্সট্যান্ট ছাড়া মরুভূমিতে চলব কি করে আমরা?'

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল শের খান। রীতিমত অমায়িক, দিল-দরিয়া মার্কা হাসি। 'চলার দরকারটাই বা কি, মিস্ কার্টার? কাজ তো সবে শুরু হলো, এই অবস্থায় কোথায় যেতে চাও তোমরা? কেন যাবে, কাজ শেষ করতে হবে না?'

চেহারা বদলে গেল তার, কঠোর হয়ে উঠল। গলার স্বরও বদলে গেছে। 'ভেবে দেখো, ট্যাবলেটের বাকি অর্ধেক কব্জা করতে তখন যদি আমি বাধা না পেতাম, তাহলে তোমাদের পিছু নেয়ার প্রয়োজন পড়ত না আমাদের। শত্রুতাও সৃষ্টি হত না। যার যার দল নিয়ে আলাদা আসতে পারতাম আমরা, তোমরা তোমাদের অংশ নিয়ে, আমরা আমাদের অংশ...'

'একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর তোমার বোধহয় জানা নেই, শের খান,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আমরা এ কাজে এসেছি সরকারের তরফ থেকে, তোমাদের মত সরকারী সম্পত্তি চুরি করতে নয়। আর শত্রুতা বাধানোর কথা যদি ওঠে, একটাই জবাব আছে তার। এবং সেটা তুমি জানো।'

'জানি। কিন্তু ট্যাবলেটের খণ্ডটা আমি গোপনেই নিতে যেতে চেয়েছিলাম। হলো না, একেবারে সময়মত কেবিনে এসে হাজির হলো বুড়ো, কাজেই খুনটা করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না আমার। আর তোমরা যে সরকারের তরফ থেকে এসেছ, তা-ও জানি। কিন্তু এ কাজে কে কোন পক্ষের হয়ে কাজ করছে, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমাদের। আমরা চাই...' থেমে হাসল লোকটা।

'ক্যামবিসিসের যাবতীয় ধন-সম্পদ। যখন দেখলাম তুমি ট্যাবলেটের দুটো খণ্ডই দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছ, তখন অন্য এক বুদ্ধি এল মাথায়। ভাবলাম, দেখি তোমার দৌড় কত।

খেটেখুটে যদি লোকেশনটা বের করতে পার, তো সময়মত তোমার ঘাড়ে পা দেয়া যাবে।

'তাই দিয়েছি। তুমি জান না আমরা, বিশেষ করে আমি, কোন কাজে হাত দিয়ে জীবনে কখনও ব্যর্থ হইনি। হারতে আমি অভ্যস্ত নই। দেখো, এ ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। তোমাদের নিয়তি তোমরা নিজেরাই ঠিক করেছ। এ জন্যে আমি দায়ী নই, দায়ী তোমার একগুয়েমী, মিস্টার রানা। বিগ সেভেনের সাথে লাগতে এসে তোমার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি ক্ষমতাশালীরাও ধ্বংস হয়ে গেছে, তুমি তো কোন্ ছার!'

একটু বিরতি দিল শের খান। রানা ও সিলভিকে পালা করে দেখল। 'আমরা জঙ্গলের নীতি, "হয় মারো নয় মরো" নীতিতে বিশ্বাসী। এতদিন তোমার মার সহ্য করেছি, এবার আমাদের পালা। সমস্ত দেনা-পাওনা আজ কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে যাব, শেষ করে রেখে যাব তোমাদের দু'জনকে। যত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টই তুমি দেখাও, এখন তার এক পয়সাও দাম নেই আমার কাছে।'

'তাহলে আর দেরি করছ কেন?' আগের মতই কর্কশ গলায় বলল রানা। 'অনর্থক বক্ বক্ না করে কাজ সেরে চলে গেলেই তো পারো।' বিপদ থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ও, ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে মাথায়। বন্ধ ছিল না কাজটা, এতক্ষণ অনেক প্ল্যানই এঁটেছে; কিন্তু মন একটাকেও গ্রহণ করেনি। কারণ ওর সবই ছিল আত্মহত্যার নামান্তর।

'ওপারে যেতে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে!' হাসল খান। 'কিন্তু আমরা অত ব্যস্ত নই। আমার বন্ধুর,' ইঙ্গিতে হাবিব বে-কে দেখাল, 'কিছু পাওনা আছে মিস কার্টারের কাছে। দাউদ আর তার সঙ্গী আগে তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করবে, তারপর বাকি কাজ।'

চোখ কুঁচকে উঠল রানার। লোকটার সাথে নিজের ব্যবধান

অনুমান করে নিল। চেষ্টা করলে আচমকা দুই লাফে পৌঁছে যেতে পারবে ও খানের কাছে, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হবে না। খালি হাতে তাকে খুন করার আগেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে গুলিতে।
'কিসের পাওনা?'

'ইসমাইলিয়ায় ওর কারণে হাবিবের যে ক্ষতি হয়েছে, তার কথা বলছি!' সহজ ভঙ্গিতে বলল সে। 'টাকা দিয়ে তো সে ক্ষতি পূরণের ক্ষমতা ওর নেই, হবেও না কোনদিন। তাই হাবিব ঠিক করেছে ওর লোক দু'জন পালা করে ওকে চেটেপুটে যদ্দূর আদায় করতে পারে করবে।'

ঘাবড়ে গেল সিলভি, রানার বাহু আঁকড়ে ধরল শক্ত করে। তাই দেখে হা-হা করে হেসে উঠল খান। 'ভয় পেলে নাকি মিস্ কার্টার? তা ওরা যে প্রকৃতির তাতে ভয় পাওয়ারই কথা। কিন্তু কি আর করা! হাবিব মেয়ে-বিদ্বেষী, কাজেই ওকে দিয়ে কাজটা হবে না। আর আমাকে দিয়েও এত লোকের চোখের সামনে ওসব হবে-টবে না। লজ্জা করে। কিন্তু এদের দু'জনের ওসব নেই, মেয়ে হলেই হলো। হাউস অভ অ্যাঞ্জেলসে যত মেয়ে আসে, এরাই প্রথমে তাদের সাইজ করে লাইনে নিয়ে আসে, বুঝলে? কাজটায় আনন্দ পায় এরা।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। মরতেই যদি হয়, তাহলে অপমানিত হয়ে মরার চেয়ে লড়ে মরাই ভাল। আরেকবার নিজের ও শের খানের ব্যবধান মেপে নিল—চলবে। দুই লাফে কাছে গিয়ে চোখের পলকে হারামজাদার ঘাড় মটকে দেবে ও। তারপর কি হবে না হবে, সে পরে দেখা যাবে।

'তবে একটা ব্যাপারে সতর্ক থেকো, মিস্ কার্টার,' তর্জনী তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল খান। 'ব্যাপারটা উপভোগ্য না হলেও মুখ বুজে রাখতে হবে কিন্তু। মুখ খুললেই তোমাকে নরক

দেখিয়ে আনবে ওরা। এ ব্যাপারে আপত্তি বা কোনরকম বাধা এলে স্রেফ জানোয়ার বনে যায় দাউদ। দাউদ!'

হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। চেহারা বদলে গেছে সেকেন্ডের মধ্যে। ক্রুদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। 'নিয়ে এসো মেয়েটাকে!'

সিলভির উদ্দেশে চাপা গলায় খুব দ্রুত কিছু বলল রানা, প্রস্তুত হলো লাফ দেয়ার জন্যে। পিস্তল কোমরে গুঁজে এগিয়ে এল দাউদ, চেহারা নির্বিকার। একই সময় পিঠে আরেকটা পিস্তলের খোঁচা খেল রানা। দাউদের সঙ্গী ওটা। 'বোসো!' ওকে নির্দেশ দিল সে। 'বসে পড়ো!'

পরক্ষণে চোখের পলকে এক সঙ্গে অনেক কিছু ঘটে গেল। বাহুতে সিলভির নখের হ্যাঁচকা আঁচড় খেয়ে রানা বুঝল দাউদ টেনে নিয়ে গেছে ওকে। কিন্তু তাকাল না, সময় নেই। পিছনের দ্বিতীয় গার্ডের নির্দেশ পালনের ভান করে ঝুঁকে তার পা দুটো কোথায় কোথায় আছে দেখে নিয়ে আরেকটু ঝুঁকল, তারপর মুঠো করা বাঁ হাত সটান সোজা রেখে ধাঁই করে মেরে বসল পিছন দিকে, মোক্ষম জায়গায় আঘাত পড়তে লাথি খাওয়া কুকুরের মত 'কেঁউ!' করে উঠল লোকটা, দু'হাতে জায়গাটা চেপে ধরে কুঁকড়ে প্রায় গোল হয়ে গেল।

সেদিকেও তাকাল না ও, মুহূর্তে স্প্রিঙের মত সোজা হয়ে ঝাঁপ দিল শের খানকে লক্ষ্য করে। তখনই গুলি হলো—পরপর দুটো। একটা পিস্তলের, অন্যটা রাইফেলের। প্রথম গুলিটা করেছে দাউদ, অল্পের জন্যে রানার ডান কান মিস্ করছে ওটা। কিন্তু পরেরটা তা হয়নি, পিছন থেকে ওর জ্যাকেটের বাঁ আস্তিনের ভেতরের অংশ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। আর দুইইঞ্চি ডানে সরলেই সোজা ওর হৃৎপিণ্ডে ঢুকে যেত বুলেট।

ঝপ্ করে মাঝপথে বসে পড়ল রানা রাইফেল কোত্থেকে এল

বুঝতে না পেরে, ওদিকে সামান্য ঢিল পেয়ে দাউদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে দৌড় দিল সিলভি। ওকে তাড়া করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকে গেল লোকটা, সেকেন্ডের ব্যবধানে আবার একসঙ্গে দুটো রাইফেলের হুঙ্কার শুনে বসে পড়ল।

চেঁচিয়ে সিলভিকে শুয়ে পড়তে বলল রানা, বুঝে ফেলেছে কারা ব্যবহার করছে রাইফেল। হ্যারি পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ আর ভয় নেই। চোখ তুলে শের খানের দিকে তাকাল ও, নেই লোকটা। তীরবেগে ছুটছে প্লেনের দিকে। তবে হাবিব বে আছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আহাম্মকের মত। বুঝে উঠতে পারছে না গুলি কোনদিক থেকে আসছে। হাতে পিস্তল, কিন্তু নল মাটির দিকে।

দাউদ ও তার সঙ্গীর অবস্থাও মোটামুটি তারই মত দেখতে পেয়ে সময় নষ্ট করল না রানা, এক দীর্ঘ লাফে পৌঁছে গেল বে-র দু'হাতের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল লোকটা, কিন্তু হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে ওর মাথার অনেক ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বুলেট। সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে বে-র চোখে নগ্ন আতঙ্ক দেখতে পেল রানা, পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে পা তুলেছে।

ব্যাটার তেলতেলে, সুন্দর নাকটা সই করে প্রচণ্ড এক হেভিওয়েট চালাল ও। টসটসে প্যাকা ফলের মত ভর্তা হয়ে গেল ওটা, রক্তে তার নাক-মুখসহ রানার হাত পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেল। গুঙিয়ে উঠল হাবিব বে, উড়ে গেল। একই মুহূর্তে রাইফেলের আওয়াজ ও একটা অপার্থিব চিৎকার শুনে ঘুরে তাকাল রানা। ওটা দাউদ, দু'হাত শূন্যে তুলে বসা থেকে একটা পাক খেয়ে আছড়ে পড়ল সে। মুখ দিয়ে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বের হচ্ছে। দ্বিতীয় গার্ডকে কোথাও দেখতে পেল না ও—বোধহয় শের

খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। সিলভিরও পাত্তা নেই।

ওদিকে রাইফেলের সংখ্যা বেড়ে গেছে, এখন কম করেও চারটা থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। কিন্তু এদিকে আর আসছে না গুলি। তার মানে শেরখানকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হচ্ছে, অনুমান করল রানা। সামনে তাকাল, দেখল টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে বে। পড়ে যাওয়া পিস্তল ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। অন্ধ আক্রোশে দু'পা এগোল ও, খপ্ করে বাড়ানো হাতের কব্জি ও চুলের মুঠি ধরে তুলে দাঁড় করাল তাকে। কোন দয়া-মায়া দেখানোর কথা ভুলেও মাথায় ঠাঁই দিল না রানা, এরা সেসবের যোগ্য নয়।

হাতটা গায়ের জোরে মুচড়ে পিছনে নিয়ে এল ও, বে-র চিৎকারে কান না দিয়ে এক টানে তুলে ফেলল ওপরদিকে। মট্ করে শব্দ উঠল কাঁধের কাছে, হাড়ের জোড়া খুলে গেছে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হাবিব বে, কিন্তু রানার কানে গেল না। এখন যত অসহায়ই মনে হোক, কয়েক মিনিট আগে এরাই ওদের দু'জনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে যাচ্ছিল। মরিস কার্টারের খুনীদের একজন এই লোক, সুযোগ পেলে আরও অনেকের মৃত্যুর কারণ হবে, কাজেই একে ছেড়ে দেয়ার কথা একবারও ভাবল না ও। মাথায়ই এল না সে চিন্তা।

ভাঙা হাত ছেড়ে লাথি মেরে লোকটাকে দূরে সরিয়ে দিল ও, মাটি থেকে তার পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে বুক সই করে তুলল। রক্তাক্ত নাক আর হাতের ব্যথায় বিশ্রীরকম কুঁচকে ছিল বে-র চেহারা, ওটার ওপর চোখ পড়তেই সমান হয়ে গেল। ঝুলে পড়ল চোয়াল।

'ভাগ্যের ছক এভাবে উল্টে যেতে পারে কখনও কল্পনা করেছ, হাবিব বে?' শান্ত, নিরাসক্ত গলায় বলল ও। 'কেমন লাগছে

এখন?'

'তু-তুমি...তুমি...'

'হ্যাঁ, খুন করতে যাচ্ছি আমি তোমাকে, এখনই। কারণ আমিও মাঝেমধ্যে তোমাদের মত জঙ্গলের নীতিতে চলি। নইলে বহু আগেই মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

আহত পশুর মত গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে লোকটার গলা দিয়ে, মুখের সামনে ভাল হাতটা তুলে রেখে এক পা এক পা পিছিয়ে যাচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে নীল হয়ে উঠেছে চেহারা। 'না! পি-প্লীজ...না...'

গুলি করল রানা, ঠিক লোকটার দুই চোখের মাঝখানে। ঝাঁকি খেয়ে ভাল হাতটা শূন্যে উঠে গেল, পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে চিত হয়ে পড়ে গেল হাব্বির বে। দেহটা স্থির হয়ে যেতে প্লেনের দিকে তাকাল রানা। পৌঁছে গেছে শের খান। দ্বিতীয় গার্ড রয়েছে তার সামান্য পিছনে। ও ব্যাটা কখন পালাল, কোনদিক দিয়ে, টেরই পায়নি রানা। শেষ কয়েক পা অতিক্রম করে খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল প্লেন। বিপদ টের পেয়ে আগেই স্টার্ট দিয়ে রেখেছিল পাইলট।

কয়েকটা রাইফেলের বিরতিহীন হুঙ্কার অগ্রাহ্য করে দৌড় শুরু করল ওটা। দূর থেকে টেইলসহ ওটার এখানে-সেখানে বেশ কিছু বুলেট বিঁধতে দেখল রানা, কিন্তু কাজ হলো না। সংক্ষিপ্ত দৌড় শেষ করে খুব দ্রুত আকাশে উঠে পড়ল প্লেন, পড়িমরি করে ছুটল।

এবার সাহায্যকারীদের দেখতে পেল রানা, ঝোপ, বালির ঢিপি ইত্যাদির আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল মানুষগুলো। হ্যারিকে দেখা গেল ছুটে আসতে। সঙ্গে ওদের আরব এসকর্ট। জানে লাগানো সম্ভব নয়, তবু ওদের কয়েকজন প্লেনের পিছন

পিছন ছুটল। সমানে চ্যাচাচ্ছে আর গুলি করছে। কিন্তু ব্যাটাদের টিপ্ সম্পর্কে জানা হয়ে গেছে রানার, তাই ফল দেখার অপেক্ষায় না থেকে সিলভির খোঁজে এগোল। গাড়ির ওপাশে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল ও, রানাকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। হাসছে, অথচ চোখে পানি। দৌড়ে এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

এক মিনিট পর মুখোমুখি হলো রানা ও হ্যারি। অনেকটা ওয়াটার লূ যুদ্ধের পর ওয়েলিংটন ও ব্লিউচারের মোলাকাতের মত হলো ওদের সাক্ষাৎ। দু'জন পরস্পরের হাত ঝাঁকাচ্ছে তো ঝাঁকাচ্ছেই, থামাথামির লক্ষণ নেই। একটু পর হাঁপাতে হাঁপাতে সীনে এসে হাজির হলো ক্লারিসা। প্রথমে রানাকে আলিঙ্গন করে আনন্দ প্রকাশ করল মেয়েটি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বান্ধবীর ওপর।

আনন্দ উত্তেজনার ধাক্কা কমে আসতে রানার প্রশ্নের জবাব দিতে বসল হ্যারি। জানাল, ওদের খুঁজে বের করতে শের খানই সাহায্য করেছে তাকে। আগের দিন বিকেলে রানা-সিলভি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায়নি দেখে ওদের খুঁজতে বেরিয়েছিল স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরাই পথ হারিয়ে ফেলে অন্ধকারে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে রাত একটার দিকে কোনমতে ক্যাম্পের খোঁজ পায় ওরা, বলতে গেলে স্রেফ ভাগ্যের জোরে।

এরপর খুব ভোরে পাঁচটা গাড়ি ও আরবদের নিয়ে আবার বের হয়। হ্যারি-ক্লারিসা ছিল মাঝের গাড়িতে। বাকি চারটায় এসকর্ট। মাঝেরটার দু'পাশে আধ মাইল পর পর অবস্থান নেয় এসকর্টদের গাড়ি, তারপর একযোগে গোটা এলাকায় গোল হয়ে সুইপ সার্চ শুরু করে ওরা।

শের খান পৌঁছার মাত্র আধঘণ্টা আগে হ্যারির রাইট উইং অল্পের জন্যে মিস্ করেছে ওদের। দূর থেকে শের খানের প্লেন

দেখতে পেয়ে নজর রেখেছিল হ্যারি, ওটার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয়েছে ওর। কয়েক চক্কর দিয়ে ওটাকে নেমে পড়তে দেখে সন্দেহ আরও বাড়ে, কাজেই সবক'টা গাড়িকে জড় করে তখনই এগিয়ে আসে সে। দূর থেকে রানা ও সিলভি বিপদে পড়েছে দেখে বিনাদ্বিধায় হামলা চালায়।

'প্রথম গুলিটা ছুঁড়েছিল কে?' হেসে প্রশ্ন করল রানা।

'আমি,' হ্যারি বলল চোখ পিট্ পিট্ করে। 'কেন?'

নীরবে আস্তিনের ফুটোটা দেখাল ও। লজ্জা পেল যুবক, মিনমিন করে বলল, 'তুমি যে তখনই অমন একখানা লাফ দিয়ে বসবে বুঝতে পারিনি। সরি, রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে অবশ্য তোমাকে লাফ দিতে দেখেছি, নল ঘোরাতে চেষ্টাও করেছি, কিন্তু ঠিক...'

'দ্যাটস অল রাইট, ম্যান,' তার পিঠ চাপড়ে দিল ও। 'এতে তোমার লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। বরং সময়মত আমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ বলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে।'

'কিন্তু শের খান হারামজাদাকে মারতে পারলাম না বলে দুঃখ হচ্ছে আমার।'

'সে সুযোগ আরও একবার পাব আমরা।'

'কিভাবে?' চোখ কুঁচকে উঠল হ্যারির।

মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় শের খান। মানুষ চিনতে যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে আবার আসবে সে, কোন ভুল নেই তাতে। কাজেই তৈরি থাকতে হবে আমাদের। কারণ এবার শেষ কামড় দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই আসবে লোকটা।'

নিজেদের দুঃখের কাহিনী রাতের জন্যে মুলতুবি রেখে একটু

পর কাজে হাত লাগাল রানা। অবশ্য সাফল্যের খবর জানাতে ভুলল না। অবশ্য জিনিসগুলো শের খান নিয়ে গেছে শুনে আফসোসের অন্ত থাকল না কারও।

হাবিব বে ও দাউদের দাফন সেরে গাড়িটাকে সোজা করার ব্যবস্থা করল রানা, তারপর সন্ধে পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে গেল এখানে-ওখানে। কিন্তু লাভ হলো না, আর কিছুই পাওয়া গেল না। রাতটা ওখানেই কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল ও হ্যারির সাথে আলোচনা করে। যে সময়সমীমা হাতে নিয়ে এসেছে ওরা, তা শেষ হতে আর মাত্র দু'দিন বাকি। এ সময় স্পট ছেড়ে ক্যাম্পে আসা-যাওয়ার পিছনে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তাই করিমের নেতৃত্বে কয়েকজন বাছাই করা আরবকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো, ক্যাম্প সহ সমস্ত মালপত্র নিয়ে পরদিন ফিরে আসবে লোকগুলো।

পরদিন আলো ফুটতেই সঙ্গীদের নিয়ে কাজে লেগে পড়ল রানা, সঙ্গে থাকল ছয় আরব। আগেরদিন আবিষ্কার করা সেডান চেয়ারটা ভাল করে দেখতে গিয়েই দিনের শুভসূচনা করল ক্লারিসা। ওটার সীটের তলায় কাবার্ড ধরনের একটা চেম্বার আবিষ্কার করে বসল ও। রানা বা সিলভি, দু'জনেরই চোখ এড়িয়ে গেছে ওটা। চেম্বার থেকে বের হলো বড়সড় একটা হাতির দাঁতের বাক্স। ওপরে সদৃশ্য কারুকাজ করা, খুব ভারী।

ওটার ভেতরের জিনিসগুলোর ওপর চোখ পড়তে বিস্ময়ের বিচিত্র সব ধ্বনি বেরিয়ে এল ওদের মুখ দিয়ে। অগুনতি সোনার ব্রেসলেট, আংটি, গলার হার ও নানা বহুমূল্য পাথরে ঠাসা ভেতরটা। তার মধ্যে পাতলা কাগজের মত সোনার টাকা, বড় একজোড়া খাঁটি সোনার কাপও আছে। সবগুলোর দাম কত হতে পারে, সে ব্যাপারে মোটামুটি একটা খসড়া হিসেব করল

ওরা–দু'লাখ পাউন্ড, কম করেও।

নেশায় পেয়ে বসল দলটাকে। বিকেল পর্যন্ত খুঁজে পেতে আরও কিছু জিনিস বের করল ওরা, অবশ্য সেসবের মধ্যে চারটে সোনার বার ছাড়া অন্য সব তেমন দামী নয়। বারগুলোর প্রতিটার ওজন দশ আউন্স করে।

মাসুদ রানা বিকেলটা অন্য কাজে লাগাল। পরদিন খোঁড়ার জন্যে ঘুরে ঘুরে দুটো সন্দেহজনক জায়গা বের করে চিহ্ন দিয়ে রাখল।

রাতের খাওয়া সেরে শের খানের সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে কি কি করতে হবে, সে ব্যাপারে আলোচনা করতে বিশেষ বৈঠকে বসল ওরা চারজন। প্রায় দু'ঘণ্টা চলল বৈঠক। তারপর ওই রাতেই অস্ত্রপাতি চেক করতে বসল রানা। ওর মন বলছে, শের খান বেশি সময় দেবে না। দু'চার দিনের মধ্যেই আসবে।

সবশেষে সেদিনের উদ্ধার করা জিনিসগুলোর নিরাপত্তার ব্যাপারে ভাবতে বসল। যদিও ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওগুলো যেন-তেনভাবে রাখলেও ক্ষতি নেই, এসকর্টদের প্রত্যেকে করিমের বাছাই করা বিশ্বস্ত লোক, ভুলেও ছুঁয়ে দেখবে না কিছু। তবু, অভাবী মানুষের চোখের সামনে তাকে বিপথে যেতে সাহায্য করে এমন কিছু ঝুলিয়ে রাখতে চায় না ও। তেমন কিছু ঘটে গেলে দলনেতা হিসেবে দায়টা ওর ঘাড়েই পড়বে।

ভেবেচিন্তে সব চার ভাগ করল রানা, এক ভাগ নিজে রেখে হ্যারি, ক্লারিসা ও সিলভিকে দিল বাকি তিন ভাগ। যার যার সঙ্গে রাখল ওরা জিনিসগুলো। কিছু রাখল পকেটে, কিছু গোটানো আস্তিনের মধ্যে।

ভোরে সূর্য ওঠার আগে চার এসকর্টকে বড় ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজে লাগিয়ে দিল রানা, শের খান এলে ওটা কাজে লাগবে।

একজনকে পাঠাল রিজের ওপর বসে চারদিকে কড়া নজর রাখতে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্কেত দেবে সে। ওদিকে ন'টার দিকে মালপত্রসহ ফিরে এল করিম, নতুন ক্যাম্প খাড়া করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যেখানে সেডান-চেয়ার পাওয়া গেছে, এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্যে সেখানে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে নির্দেশ দিয়েছিল রানা। কাছেপিঠে আরও কিছু যদি থাকে, এই সুযোগে সেগুলো বেরিয়ে পড়বে। ট্রেঞ্চটা বড় করে খোঁড়া হলো, তারপর ওটার দু'দিকে তৈরি করা হলো দুই বাহুর মত দুটো কানেক্টিং ডিচ্।

বালির প্রতিনিয়ত ওড়াউড়ির জন্যে দুপুরের দিকে বেশ কঠিন হয়ে উঠল ব্যাপারটা। যে পরিমাণ বালি তোলা হয়, তার অর্ধেকটাই আবার ফিরে আসে, বিশেষ এগোচ্ছে না কাজ। ভেবেচিন্তে সঙ্গের জিনিসপত্রের প্যাকিং বক্সের কাঠ দিয়ে ট্রেঞ্চের কিনারার বালি ঠেকানোর ব্যবস্থা করল রানা, এর ফলে কিছুটা দূর হলো সমস্যা। মোটামুটি ভালই এগোতে লাগল কাজ।

প্রায়ই এটা-ওটা বেরিয়ে আসতে থাকল। দলের দুই মেয়েকে এখানকার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে রানা ও হ্যারি গেল আগেরদিন রানা যে দুটো সন্দেহজনক জায়গা বেছে রেখে এসেছিল, সেখানে। দুপুর নাগাদ সব মিলিয়ে দিনের প্রাপ্তি দাঁড়াল ক্যামবিসিসের নাম না জানা এক অফিসারের সোনা-রুপোর কাজ করা অস্বাভাবিক বড় আকারের এক বর্ম ও হেলমেট। ওগুলো দেখেই বোঝা যায় মানুষটার আকৃতি ছিল দানবীয়।

তার সঙ্গে বেশ কিছু স্পিয়ার হেড ও জেভলিন, আরও তিনটে হেলমেট, ব্রোঞ্জের শিল্ড, বেশ কয়েকটা মিশরীয় দেব-দেবীর খাঁটি সোনার মূর্তি, একটা আংটি, বহুমূল্য পাথর বসানো একটা হেভি ব্রেসলেট সেট ও আরও চারটে দশ আউন্সের সোনার বারও ছিল।

দুপুর দেড়টায় চেঁচিয়ে ওদের সতর্ক করল ওয়াচম্যান। রিজের ওপর থেকে হাত তুলে দক্ষিণ দিকটা দেখাচ্ছে ঘনঘন। উত্তেজিত।

রানার অনুমান সত্যি হয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যেই ফিরে এসেছে শের খান।

এগারো

ট্রেঞ্চের একটু দূরে বিশ্রামের জন্যে তৈরি ত্রিপলের শেডে লাঞ্চ খাচ্ছিল রানা, হ্যারি, সিলভি ও ক্লারিসা। চিৎকারটা কানে আসামাত্র ধড়মড় করে উঠে পড়ল ওরা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটাকে দেখতে পেল। বেশ বড়, টুইন এঞ্জিনের দানব একটা। উল্টোদিকে আরেক রিজ টপ্‌কে এসে পড়েছে প্রায়।

কাজে ঢিলেমির জন্যে মনে মনে অলস ওয়াচম্যানের পিণ্ডি চটকাতে লাগল রানা, আরও অন্তত এক মিনিট আগে ওটাকে দেখতে পাওয়া উচিত ছিল ব্যাটার। কিন্তু এখন তা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই, ক্যাম্পের সবাইকে চেঁচিয়ে সতর্ক করে সিলভির হাত ধরে ট্রেঞ্চের দিকে ছুটল ও। হ্যারি-ক্লারিসাসহ যে দুয়েকজন আরব সঙ্গে ছিল, পিছন পিছন তারাও।

আর সবাই রয়েছে তিনশো গজ দূরের মূল ক্যাম্পে। ওয়াচম্যান, এবং তারপরই রানার হাঁক কানে যেতে খাওয়া ফেলে উঠে পড়ল লোকগুলো, যে যার অস্ত্র তুলে নিয়ে মুখ নাড়তে নাড়তে ঝেড়ে দৌড় লাগাল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। ততক্ষণে

অনেক কাছে এসে পড়েছে প্লেন, ডাইভ শুরু করেছে। ওটার কানে তালা লাগানো গর্জনে চাপা পড়ে গেল সমস্ত কোলাহল।

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু হলো ওটা থেকে। আঁতকে উঠল রানা—মেশিনগান! মেশিনগান নিয়ে এসেছে হারামজাদা শের খান! মাত্র দশ ফুট সামনে দিয়ে মাটিতে গর্ত করে একসার বুলেট ছুটে যাচ্ছে দেখে দিক্ বদলাল রানা। ওদিকে প্রথম রিজ থেকে প্রায় উড়ে নেমে আসছিল ওয়াচম্যান, কিছু বুঝে ওঠার আগেই সারির লেজ ছুঁয়ে ফেলল তাকে। ওপর থেকে মাথায়, কাঁধে পেরেকের মত তিন-চারটে বুলেট বিঁধতে হঠাৎ দৌড়ের গতি থেমে গেল, তারপর আছড়ে পড়ল লোকটা। কয়েক গড়ান দিয়ে স্থির হয়ে গেল। অজান্তে চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল রানার, মুচড়ে উঠল বুকের মধ্যে।

ট্রেঞ্চে নিরাপদেই পৌঁছল ওরা। ওদিকে ক্যাম্পে তখনও দৌড়-ঝাঁপ চলছে। করিমকে দেখতে পেল রানা, ধমক ধামক মেরে গাড়ির তলায় ঢোকাচ্ছে সশস্ত্র সঙ্গীদের। ফাঁকে ফাঁকে মৃত ওয়াচম্যানের দিকে তাকাচ্ছে। ছেলেটা ওর ভাইপো, রানা জানে। তার মৃত্যুতে লোকটার কত কষ্ট হচ্ছে অনুভব করার চেষ্টা করল ও।

এরমধ্যে অনেক নিচে নেমে এসেছে প্লেন, বড়জোর দুশো ফুট ওপর থেকে এক উইং মাটির দিকে তাক্ করে ঘুরল ওটা, মাটিতে নিজের বিশাল ছায়া ফেলে ছুটে আসতে লাগল। সেদিনেরটার তুলনায় অনেক বড় এটা, মানুষ ধারণক্ষমতা কম করেও এক কুড়ি হবে।

রাইফেল তুলে প্রস্তুত হলো রানা ও হ্যারি, কিন্তু এত দ্রুত এসে পড়ল ওটা যে কেউ একটার বেশি গুলি ছোঁড়ার সুযোগই পেল না। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে সূর্য আড়াল করে অতিকায় এক

উড়ন্ত দানবের মত চলে গেল। মেশিনগানের একটানা ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দে কেঁপে উঠল গোটা উপত্যকা। আওয়াজ শুনে রানার সন্দেহ হলো একটা নয়, কয়েকটা মেশিনগান থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে উল্টোদিকের রিজের আড়ালে চলে গেল প্লেন, একটু পরই দেখা দিল আবার, খাড়া উঠে যাচ্ছে। এই সুযোগে করিমকে লোকজন নিয়ে ট্রেঞ্চে চলে আসতে নির্দেশ দিল রানা। প্লেনটাকে ঘায়েল করতে হলে কনসেন্ট্রেটেড আক্রমণ ছাড়া উপায় নেই, কাজেই সবাই একসঙ্গে থাকলে সুবিধে। সময়মত যদি নির্দেশটা পালিত হত, কোন সমস্যা হত না। কিন্তু হলো না তা।

করিম আর মুসা সঙ্গে সঙ্গে দৌড় শুরু করল, ওদের দেখাদেখি আরও দু'জন এল। কিন্তু বাকি সাতজন দ্বিধায় পড়ে মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করে ফেলল। ততক্ষণে ঘোরা শেষ করেছে প্লেন, পরের রাউন্ড শুরু করতে তেড়ে আসছে। প্রথম দলের চারজন হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে গেল ট্রেঞ্চে, অন্যরা তখন সবে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে। বিপদ টের পেয়ে মনে মনে হায় হায় করে উঠল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে গলার সমস্ত শক্তি এক করে চেঁচাতে লাগল মানুষগুলোর উদ্দেশে–ফিরে যেতে বলছে আগের জায়গায়। হ্যারি, করিম ও মুসাও চেঁচাচ্ছে ওর সাথে, কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না। ত্রাসের কারণে আসল বিপদ দেখল না কেউ।

ফল হলো মর্মান্তিক। ট্রেঞ্চের মাত্র ত্রিশ গজ দূরে মেশিনগানের গুলি বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেল মানুষগুলো। পরের দশ সেকেন্ড ধরে চলল তাদের আতঙ্কিত চিৎকার, উন্মত্তের মত এলোপাতাড়ি দৌড়ঝাঁপ, ধুপ্‌ধাপ্ আছড়ে পড়ার শব্দ আর ধুলোর জায়গা বদল। বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা, নাকের সামনে দিয়ে উড়ে গেল প্লেন, গুলি করার কথা খেয়াল

থাকল না।

ওদের মধ্যে হামিদ নামে এক ড্রাইভার অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল, একটা গুলিও লাগেনি। বাকি পথ হামাগুড়ি দিয়ে এসে ট্রেঞ্চের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল সে, আতঙ্কে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার অবস্থা। ঘামে জবজব করছে সারামুখ। ওদিকে খোলা জায়গায় আহতরা গোঙাচ্ছে, কাতরাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রেঞ্চে নিয়ে আসা দরকার হতভাগ্য মানুষগুলোকে।

প্লেন আবার ঘুরতে শুরু করেছে, এখনই ভয়ের কিছু নেই দেখে একলাফে উঠে পড়ল রানা। হ্যারিও ওকে অনুসরণ করতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল। 'না! মেয়েদের কাছে থাকা দরকার তোমার। আমি একাই যাব।'

আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটল ও। কিন্তু দেহগুলোর কাছে পৌঁছে দ্বিধায় পড়ে গেল কার সাহায্য সবচেয়ে বেশি জরুরী বুঝতে না পেরে। দু'জন নিঃসাড় হয়ে গেছে এরই মধ্যে। আরও তিনজন প্রায় শেষ, কোন সাহায্যই কাজে আসবে না ওদের। বাকি আছে একজন, গুলিতে এক পায়ের গোড়ালি গুঁড়ো হয়ে গেছে তার।

সিলভির চিৎকারে ঘুরে তাকাল রানা, প্লেনের ব্যাপারে সতর্ক করছে ওকে। আসছে ওটা। ব্যস্ত হয়ে কাছের মৃতদেহটার দিকে ছুটল ও, কুক আবদুল্লাহর লাশ ওটা। একটাই মাত্র গুলি খেয়েছে সে, সরাসরি হার্টে। ওটা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে হুমড়ি খেতে খেতে আহত পায়ের লোকটার কাছে ফিরে এল রানা, লাশটা লম্বালম্বি করে তার গায়ের ওপর শুইয়ে দিয়ে বলল, 'এটা ধরে থাকো, খবরদার, ছেড়ো না।'

পরমুহূর্তে তীরবেগে ট্রেঞ্চের দিকে ছুটল। এসে পড়েছে প্লেন, সেকেন্ডে সেকেন্ডে আওয়াজ বাড়ছে। দৌড়ের ওপর তাকাল রানা,

দেখল আকাশ প্রায় ঢেকে ফেলেছে ওটা। এত কাছে এসে পড়েছে যে পাইলটের পাশে ঝুঁকে থাকা লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। শের খান ওটা, দাঁত বের করে হাসছে।

গর্জে উঠল মেশিনগান, তার ঠিক এক সেকেন্ড আগে ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েছে রানা। গুলির লাইন ট্রেঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছাবার আগেই ভেতরে আছড়ে পড়ল, নিশ্চিন্ত হয়ে পাল্টা গুলি করতে লাগল হ্যারিসহ অন্য সবাই। লাগল কি না বোঝা গেল না, তবে এত কাছ দিয়ে গেছে প্লেন, দু'চারটা না লাগাই বরং অস্বাভাবিক। এদিকে ওদের শেড, পানির কন্টেইনার, প্লেট-গ্লাস, সব টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে উড়তে লাগল মেশিনগানিঙের তোড়ে।

একটু পর আবার ফিরে এল প্লেন—আবার, আবার। এখন আর বেশি দূর পর্যন্ত যাচ্ছে না, শত্রু কোথায় জানে ওরা, তাই অল্প জায়গায় চক্কর দিচ্ছে। এদিকে ট্রেঞ্চ থেকে সাত-আটটা রাইফেল গর্জন করে চলেছে, কিন্তু ফল যে তেমন হচ্ছে না, দেখেই বোঝা যায়। ক্রমে সাহস বরং বাড়ছে ওটার, প্রতি চক্করে একটু একটু করে কাছিয়ে আসছে।

ওটার সপ্তম হামলায় খোলা জায়গায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া লোকটা ট্রেঞ্চে বসে মরল, ওয়াচম্যানের মত মাথার তালু ও কাঁধে কয়েকটা বুলেট খেল সে। নবম হামলার সময় হ্যারি আহত হলো, বাঁ বাহুতে ঘষা খেয়ে গেছে একটা বুলেট। একে প্লেন, তারওপর একাধিক মেশিনগানের একটানা গুলিবর্ষণ, কিছু করার সুযোগই পাচ্ছে না রানা। মাথা তুলতেই পারছে না।

অসহায় বোধ করছে ও। মনে হচ্ছে শের খানের হাতে সবার মৃত্যু কেবল সময়ের ব্যাপার। এখন একমাত্র রাতের অন্ধকার ওদের বাঁচাতে পারে, কিন্তু তার এখনও অনেক দেরি। ট্রেঞ্চের ভেতর অসহ্য গরম, তার সাথে ঘাম ও রক্তের গন্ধ মিশে অদ্ভুত

এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এতকিছুর সাথে রয়েছে সার্বক্ষণিক আতঙ্ক। দিশেহারা অবস্থা সবার।

বারোতম চক্করের সময় ঘাড়ে গুলি খেল করিম। ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো ওদের, কিছুতেই থামানো গেল না। পাঁচ মিনিট পর রানার কোলে মাথা রেখে মারা গেল মানুষটা। তার মৃত্যু বড় ধরনের এক ঝাঁকি দিয়ে গেল ওকে। দেশের বাইরে এমন স্নেহশীল, সাহসী আর সাহায্যকারী সুহৃদ জীবনে খুব কমই জুটেছে ওর। গত কয়েকদিনের ঝড়-ঝঞ্ঝার মুখে যে ভাবে সব ব্যাপারে ওকে সাহায্য করেছে করিম, তার কোন তুলনা হয় না। তার মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী করল রানা। লোকটাকে ও-ই টেনে নিয়ে এসেছে এরমধ্যে।

আস্তে করে তার মাথা নামিয়ে রাখল ও। সিলভিকে দেখল, ভয়ে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে ওর। ক্লারিসার অবস্থাও এক, শুকনো মুখে হ্যারির পাশে বসা। আরবদের আর মাত্র ছয়জন জীবিত আছে। তার মধ্যে করিম ও মুসার সঙ্গে আসা প্রথম দু'জন—ড্রাইভার হামিদ এবং পোর্টার সাফির, মুসা ও এক পা অকেজো হয়ে যাওয়া আরেক পোর্টার, জাকরি—যাকে আবদুল্লাহর মৃতদেহ দিয়ে ঢেকে রেখেছিল রানা। পরের সুযোগে হ্যারি আর করিম মিলে তাকে নিয়ে এসেছে। অন্য দু'জন প্রথম থেকেই ওদের সাথে ছিল। পোর্টার মাহমুদ ও আবু খাত্তাব।

মুসা আর হামিদ তখনও সুযোগ পেলেই গুলি ছুঁড়ে চলেছে প্লেনের দিকে। অন্যরা কুঁকড়ে আছে। ভয়ে কাঁপছে। ওদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না, বুঝল রানা। বাঁ হাত অকেজো বলে হ্যারিকেও হিসেবের বাইরে রাখতে হচ্ছে। আর তাহলে থাকে তিনজন, রানাসহ। আপনমনে মাথা দোলাল রানা, আশা খুবই কম।

করিম মারা যাওয়ার পর দু'বার ঘুরে গেছে প্লেন। এ মুহূর্তে

রিজের আড়াল থেকে ওটার আওয়াজ আসছে কেবল, দেখা নেই। কি চলছে ওপাশে? সেকেন্ডের জন্যে মনে দূরাশা জাগল, হয়তো মুসা-হামিদের গুলিতে এতক্ষণে কাজ হয়েছে। নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে ওটা।

কিন্তু না, কিছুই হয়নি। একটু পরই দেখা গেল ল্যান্ড করেছে ওটা, দৌড়ে ওদের ক্যাম্পের আড়ালে গিয়ে থেমে পড়েছে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে শুধু লেজ আর নাক দেখা যাচ্ছে, আর কিছু না। কি হচ্ছে ওখানে? চোখ কুঁচকে উঠল রানার, ওদের ক্যাম্পে কি কাজ হারামজাদা শের খানের? তাকিয়ে থাকল ও, কিন্তু অনেকক্ষণ পেরিয়ে যেতেও কাউকে দেখতে পেল না।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ কিছু একটা সন্দেহ হতে ঝট্ করে পিছনে তাকাল রানা, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল লোকগুলোকে। দু'জন ওরা। একটু আগে যে রিজের ওপাশে কিছু সময়ের জন্যে প্লেনটা থেমেছিল, সেটার আড়ালে আড়ালে ঘুরে পিছনদিক থেকে এসেছে ব্যাটারা। একজনের হাতে রাইফেল, অন্যজনের হাতে টমিগান। যথাসম্ভব ঝুঁকে নিঃশব্দে এগোচ্ছিল, আর মাত্র কয়েক গজ আসতে পারলেই ওদের পঞ্চাশ গজ পিছনে বড় এক ঝোপের আড়াল পেত।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, হলো না। রানা আচমকা ঘুরে তাকাতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল দুজনেই, পরমুহূর্তে কোনাকুনি ঝোপের দিকে ছুটল। বাঁ থেকে ডানে। কোন সিঙ্গল শট অস্ত্রের সাহায্যে ওরকম টার্গেট ভেদ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু রানার জন্যে সেটা বড় সমস্যা নয়। মুসা ও হামিদকে সতর্ক করেই রাইফেল তুলল ও, স্টক কাঁধে ঠেকিয়েই গুলি করল প্রথমজনের এক ইঞ্চি ডানদিক লক্ষ্য করে। নির্ভুল নিশানা, হিসেব করা।

সোজা লোকটাকে সই করে গুলি ছোঁড়েনি ও; তাতে মিস্

হওয়ার চান্স ছিল টার্গেটি চলমান বলে, ছুঁড়েছে এক সেকেন্ড পর সে যেখানে পৌঁছবে, সেখানে। ঠিক বুকের মাঝখানে গুলি খেয়ে আধপাক্ ঘুরে প্রথমে বসে পড়ল মানুষটা, তারপর শুয়ে পড়ল আস্তে করে। কিন্তু অতকিছু দেখার সময় ছিল না রানার, প্রথম গুলি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র বোল্ট টেনে তৈরি হলো ও। তবে দরকার হলো না, কানের পাশে টাশ্‌শ্‌! টাশ্‌শ্‌ করে গর্জে উঠল মুসা ও হামিদের রাইফেল—প্রায় একযোগে।

চিৎকার করে পড়ে গেল দ্বিতীয়জনও, বাঁ উরুর হাড় চুরমার হয়ে গেছে তার। অস্ত্র ফেলে ক্ষতস্থান চেপে ধরে গড়াগড়ি খেতে লাগল লোকটা, চেঁচাচ্ছে ষাঁড়ের মত। দ্বিতীয় গুলিতে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল রানা। বিস্মিত দৃষ্টিতে লাশ দুটো দেখল কয়েক সেকেন্ড। এমন মারাত্মক বিপদ এত সহজে কেটে গেল, যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ভাবটা কেটে যেতে এতক্ষণে একটা কাজের কাজ করা গেছে ভেবে কিছুটা আস্থা ফিরে এল ওর মধ্যে।

মুসা-হামিদকে পিছনদিকে নজর রাখতে বলে ক্যাম্পের দিকে ফিরল। কোন সাড়া নেই ওদিকে। প্লেন জায়গায় অনড়, কারও সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল ও, চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে থেমে গেল, আবার তাকাল। কেউ একজন উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে হ্যারি-ক্লারিসার তাঁবুর পিছন থেকে। ঠিক দেখেছে তো ও? কয়েক সেকেন্ড পর বুঝল ঠিকই দেখেছে।

কেউ একজন বসে আছে ওখানটায়, খানিক পর পর গলা বাড়িয়ে এদিকটা দেখে নিয়ে মুখ পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় গুলির ফলাফল বোঝার চেষ্টা করছে। পিলে চমকানো কঠোর একটুকরো হাসি ফুটল রানার মুখে, রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে জায়গাটা নিশানা করে অপেক্ষায় থাকল। আবার দেখা

দিলেই…ওর ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই উঁকি দিল মুখটা। পরক্ষণে গর্জে উঠল রানার রাইফেল, মুখের মালিক ও নিজের মাঝখানে তাঁবুটা নেই ভেবে আন্দাজে গুলি করেছে।

তাঁবুর কাপড় ভেদ করে জায়গামতই লাগল বুলেট, ক্যাঙ্গারুর মত এক লাফে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল কেউ একজন। ঠিক বের হলো না, বুলেটের ধাক্কায় খানিকটা পিছিয়ে পড়ে গেল। আর নড়ল না। পরের কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ ওদিকে, কোন নড়াচড়া নেই। বাতাস বালি ওড়াচ্ছে কেবল। গোঙাচ্ছে।

'ব্যাপার কি?' হ্যারি বলল পাশ থেকে। 'এত নীরব কেন?'

শ্রাগ করল রানা। 'বুঝতে পারছি না।'

'অন্যরা ভেগে গেছে মনে হয়,' ক্লারিসা বলল।

'আমার মনে হয় আমরা আর কি কি পেয়েছি, তা চেক্ করতে ওপাশ থেকে তাঁবুগুলো সার্চ করতে গিয়েছিল শের খান,' বলল রানা। 'তাই আমাদের ব্যস্ত রাখতে পিছন থেকে দুজনকে পাঠিয়েছিল, যাতে আমরা ক্যাম্পের দিকে নজর দিতে না পারি।' হাসল ও। তাই যদি হয়, তাহলে বড় এক গোল্লা পেয়েছে শের খান। কারণ সে সব ওদের সঙ্গেই আছে, ক্যাম্পে কিচ্ছু নেই। 'শের খান…!' সিলভিকে আঁতকে উঠতে শুনে থেমে গেল ও। 'রানা! ক্যাম্প…আগুন…'

একযোগে ঘুরে তাকাল সবাই, দেখল আগুন ধরে গেছে ক্যাম্পে। দেখতে দেখতে সবগুলো তাঁবু দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। 'যাহ্!' অস্ফুটে বলল ক্লারিসা।

'এর কোন অর্থ হয় না,' হ্যারি মন্তব্য করল। 'এখানে কাজ করতে হলে ওদেরকেও তো ক্যাম্প করতে হবে। জ্বালিয়ে না দিয়ে আমাদের ক্যাম্প দখল করে নিলেই তো শের খানের কষ্ট কম হত।' একটু বিরতি দিল সে। 'ব্যাটা আহাম্মক!'

মাথা দোলাল রানা। 'ওর আসল উদ্দেশ্য তুমি বুঝতে পারোনি, বন্ধু। এত কিছুর পরও আমরা বেঁচে আছি, উল্টে আমাদের হাতে ওর তিনজন মরেছে, এই রাগে কাজটা করেছে শের খান। যাতে আমরা না খেয়ে মরি, আর ও ক'দিন পর ফিরে এসে নিশ্চিন্তে কাজ সারতে পারে।'

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছ তুমি। ব্যাটা বুঝতে পেরেছে শুধু মেশিনগানিং করে চূড়ান্ত জয় অর্জন করা যায় না।'

'ঠিক।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু আকাশের অস্বাভাবিক চেহারা দেখে থমকে গেল। 'কি ব্যাপার!'

ধোঁয়ার মত প্রতিনিয়ত পাক্ খেতে থাকা বিশাল মেঘের পাহাড় ধেয়ে আসছে উত্তর দক্ষিণ কোণ থেকে, ওদের মাথার ওপর জমা হচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাতাস সম্পূর্ণ থেমে যেতে গুমোট হয়ে উঠল পরিবেশ। আকাশ লাল হয়ে উঠল। অশুভ নিস্তব্ধতা। একটু পর আবার শুরু হলো বাতাস, তবে অন্যরকম শক্তি নিয়ে। ধুলোয় প্রায় আঁধার হয়ে উঠল চারদিক।

'ঝড়!' সিলভি বলল রুদ্ধশ্বাসে। 'গিলবি আসছে!'

যদিও বলার দরকার ছিল না, সবাই বুঝতে পারছে কি আসছে। গোঙাতে শুরু করেছে বাতাস। ক্রমে বেড়ে চলেছে গোঙানি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেড়ে ভয়াবহ ক্রুদ্ধ গর্জনে পরিণত হলো তা, বাতাসের তোড়ে দাঁড়িয়ে থাকাই সমস্যা হয়ে উঠল। বসে পড়ল সবাই, তাতেও সুবিধে হচ্ছে না দেখে শুয়ে পড়ল মাটিতে মুখ গুঁজে।

বাতাসের গর্জন বাড়ছে, টানা, তীক্ষ্ণ বাঁশির মত আওয়াজ। ট্রেঞ্চ থেকে ওদের টান মেরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। মাটি কামড়ে থেকেও ভয় যাচ্ছে না, বাতাসের পিলে চমকানো ভয়াবহ শব্দে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল সবার। কিন্তু বলতে গেলে শুরু

ছিল ওটা, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভয়াবহ রুদ্র চেহারা নিয়ে সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরুভূমির হারিকেন। উড়ন্ত ধুলোবালির পুরু মেঘে সবকিছু ঢাকা পড়ে গেল, তিন-চার ফুটের ওপাশে কিছুই দেখা যায় না। দম আটকে মরার অবস্থা হলো ওদের।

ঝড় কয়েক মিনিট এই বেগে চললে মৃত্যু নিশ্চিত, বুঝতে দেরি হলো না মাসুদ রানার। তাই মরিয়া হয়ে বিপজ্জনক এক সিদ্ধান্ত নিল ও—এর মধ্যেই শের খানের প্লেনে পৌঁছতে হবে যেভাবে হোক। বসে থেকে মরার চেয়ে একটা কিছু করে মরা ভাল। চিৎকার করে অন্যদের ব্যাপারটা বোঝাতে মূল্যবান একটা মিনিট নষ্ট হয়ে গেল, তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে ওর পরিকল্পনায় তেমন আপত্তি জানাল না কেউ। কাপড় দিয়ে নাক-মুখ বেঁধে প্রস্তুত হয়ে নিল সবাই।

আহত জাকরির পক্ষে হাঁটা অসম্ভব, তাই ওকে রেখেই যেতে হবে। লোকটাকে শুয়ে থাকতে বলল রানা, তারপর আর সবাই পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে সাবধানে উঠে পড়ল ট্রেঞ্চ ছেড়ে। পরক্ষণে সান হেলমেট হারাতে হলো সবাইকে, খোলা বাতাসে শোলার মত উড়ে গেল ওগুলো। নাকেমুখে গরম বাতাসের ঝাপ্টা লাগছে, অনবরত খামচি মারছে যেন বাতাস।

কোন্‌দিকে যেতে হবে জানা আছে রানার, তবু কিছুক্ষণের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। চারদিকের অবস্থা দেখে বুক কেঁপে উঠল, মনে হলো ভুল হয়ে গেছে। এরমধ্যে ট্রেঞ্চ ছেড়ে ওঠা ঠিক হয়নি। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টাল না ও। শের খানের হাত থেকে বাঁচার, এবং প্রতিশোধ নেয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। সফল হলে তার সাথে প্লেনটাও কব্‌জায় আসবে, কাজেই ঝুঁকি তো নিতেই হবে কিছু।

যতদূর সম্ভব নিচু হয়ে পা চালাল দলটা—দুই মেয়েসহ রানা,

হ্যারি, হামিদ, মুসা, করিম, সাফির, মাহমুদ ও আবু খাত্তাব। প্রত্যেকে সশস্ত্র। সিলভি ও ক্লারিসার কাছে শুধু পিস্তল। ঝড়ের ক্রুদ্ধ গর্জনে শঙ্কায় বুক কাঁপছে, কাঁচের মত ধারাল, সূক্ষ্ম বালিকণার আঘাতে মুখ-হাতের উন্মুক্ত অংশ জ্বালা করছে, প্রতিমুহূর্তে বাতাসে উড়ে যাওয়ার ভয়, তবু কঠোর এক প্রতিজ্ঞা এগিয়ে নিয়ে চলেছে রানাকে। অন্যরা এগোচ্ছে ওর প্রতি অগাধ আস্থার টানে।

কতক্ষণ বা কতযুগ পর মনে নেই, তবে একসময় রানার মনে হলো জায়গামত এসে পড়েছে ওরা। কিন্তু চোখে পড়ছে না কিছুই। ক্যাম্প কোথায়? প্লেনটা কতদূরে? বালির মোটা পর্দা ভেদ করে কিছুই দেখার উপায় নেই। তবে ওগুলো যে কাছেই রয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ রইল না।

সবাইকে চারদিকে সতর্ক নজর রাখতে বলল রানা। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, শের খান ও তার দলের জন্যে গিলবি একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। সে যখন ক্যাম্পে আগুন ধরাতে ব্যস্ত, ঝড় তখনই শুরু হয়। কাজেই দলবলসহ নিঃসন্দেহে বেকায়দা অবস্থায় পড়তে হয়েছে তাকে। যদি তাই হয়, তাহলে শের খানের পক্ষে হয়তো এখনও প্লেনে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। খোলা জায়গাতেই আছে ব্যাটা। কিন্তু কোথায়?

পায়ের নিচে মাটি ক্রমে উঁচু হতে শুরু করেছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ক্যাম্প এখানেই কোথাও। কোনদিকে, ডানে না বাঁয়ে? এদিক-ওদিক করতে লাগল ওরা। অজান্তেই কখন যেন সমতল হয়ে এল মাটি, ভুল পথে এসেছে বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় একটা ছায়া দেখা দিল।

'এদিকে এসো, খোকার দল! এদিকে!'

'কে?' প্রশ্ন করল রানা। ওর ধারণাই সত্যি হয়েছে তাহলে!

'আমি, মুস্তাফা। প্লেন এদিকে। খান কোথায়?'

বুকের ভেতর চাপা উল্লাস অনুভব করল ও। 'কি জানি, দেখতে পাইনি,' বলতে বলতে দ্রুত এগোল মুস্তাফার দিকে। লোকটার তিন হাতের মধ্যে পৌঁছতে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর ডান হাতে, সজোরে পিস্তল চালাল তার চোয়াল সই করে। আন্দাজে মারলেও জায়গামতই লাগল মারটা, কারবাইন ফেলে চেঁচাবার চেষ্টা করল মুস্তাফা, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না। ভেঙেচুরে আছড়ে পড়ল। মাথার পাশে আরেক আঘাতে ঘণ্টাখানেকের জন্যে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল রানা।

পিস্তল কোমরে গুঁজে লোকটার কারবাইন তুলে নিল, টান দিল সিলভির হাত ধরে। 'এসো!'

মুস্তাফা যেদিক থেকে উদয় হয়েছে, সেদিকে কয়েক পা এগোতেই লালচে আভায় প্লেনটার বিশাল কাঠামো দেখা দিল। ওটার খাটো ল্যাডারের গোড়ায় আরও একটা মানুষের কাঠামো দেখতে পেল রানা। এক হাতে টমিগান, আরেক হাত বালি ঠেকাতে চোখের সামনে তুলে রেখেছে। এদিকেই তাকিয়ে আছে সে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

লোকটাকে প্রশ্ন করার বা কিছু বলার সুযোগই দিল না ও, একলাফে তার ঘাড়ে চড়ে বসল। ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে কারবাইনের এক বাড়িতে নাকমুখ সমান করে দিল লোকটার। পরক্ষণে কুঁচকিতে মুসার কড়া লাথি খেয়ে কুঁকড়ে গেল সে, ওই অবস্থাতেই জ্ঞান হারাল। দেহ দুটো টেনে কয়েক গজ দূরে ল্যাডারের পিছনে রেখে দিল ওরা যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে। পরেরজনের কারবাইনটাও। আরও কেউ আছে কি না খুঁজে দেখল। নেই। এবার নিশ্চিন্তে শের খানের অপেক্ষা করা যায়, ভাবল রানা।

প্লেনের দরজা আবছা দেখা যায়। ওটার গ্লাস প্যানেল থেকে হয়তো বাইরে নজর রাখা হচ্ছে, তাই সবাইকে মাথা নিচু করে রাখতে বলে ওয়ালথার হাতে আগে আগে এগোল ও। দু'তিন পা যেতে না যেতে সম্ভাবনাটা সত্যি হলো; দরজা সামান্য ফাঁক করে বেরিয়ে এল আরেক টমিগানধারী। 'কারা?'

জবাবটা দিল রানার ওয়ালথার। বুকে গুলি খেয়ে পিছিয়ে গেল গার্ড টমিগান ফেলে, পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। তারপর মুসা ও হামিদ। অন্যরাও ঢুকল এক এক করে। ককপিটের দরজার দিকে তাকাল রানা—বন্ধ। কেউ নেই ওদিকে। পিছনদিকে নজর বোলাতে ঘুরতে শুরু করেছিল ও, এই সময় পিছনের একটা নিচু, আর্মচেয়ার সীট থেকে আচমকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ছোটখাট একটা দেহ, হাতে অটোম্যাটিক। দরজা থেকে বড়জোর পনেরো গজ পিছনে রয়েছে সে, অস্ত্রটা সরাসরি রানার দিকে তাক্ করা।

'ডোন্ট মুভ!' নির্দেশ দিল সে। 'বাঁচতে চাইলে নড়বে না কেউ!'

'হ্যালো, প্রিন্সেস!' হাসি ফুটল রানার মুখে। 'এরমধ্যে তুমিও আছ দেখে ভারি অবাক লাগছে। আমার ধারণা ছিল তুমি তোমার প্যালেসে বসে হারামের কামাইয়ের টাকা গুনে আর উড়িয়েই সময় পার করো। এরকম পাইকারী খুনোখুনির মধ্যে তোমার মত অভিজাত, তা-ও এক মেয়ে,' ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল ও। 'উঁহুঁ! একদম মানায় না। সত্যি বলছি, তোমাকে দেখছি ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না,' বলতে বলতে মেয়েটির দিকে দু'পা এগোল।

চোখ জ্বলে উঠল শায়লার, অটোম্যাটিক সামান্য উঁচু করে রানার কপাল বরাবর তাক্ করল। সুন্দর মুখটায় লাবণ্যের

ছিটেফোঁটাও নেই। 'বেশি স্মার্টনেস দেখিয়ো না!' চাপা ধমক লাগাল সে। 'তোমার চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট লোক দেখেছি আমি, তাদের কেউ আজ বেঁচে নেই। থাকলে এক-আধটা নমুনা দেখাতে পারতাম। যদি ওদের মত ইতিহাস হতে না চাও, আর এক পা-ও নড়বে না। খান কোথায়?'

'আমিও তো ওর খোঁজেই এসেছিলাম। প্লেনে নেই?'

স্থির দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল প্রিন্সেস। 'কোথায় সে?'

ওর চাউনি সতর্ক হতে বলল রানাকে। শ্রাগ করল। 'আমি জানি না। গিলবিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

'মেরে ফেলেছ তুমি?'

'কী মুশকিল! হাতের কাছে পেলে তবে না মারব!'

কিছুটা স্বস্তি ফুটল শায়লার চেহারায়। 'ঠিক আছে। যার যার অস্ত্র মেঝেতে রাখো তোমরা, খুব সাবধানে। আগে তুমি, রানা।'

'যদি না রাখি?' বলল ও।

গুলি করল প্রিন্সেস। রানার বাঁ কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বুলেট গরম ছ্যাঁকা দিয়ে। আটকা জায়গায় বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠল প্রত্যেকে, সিলভি বা ক্লারিসার আঁতকে ওঠার শব্দ শোনা গেল।

মেয়েটার হাতের টিপ্ অবাক করল রানাকে। শুধু রূপের জৌলুস আর বুনো যৌবনই নয়, গুণও আছে।

'এর পরের গুলি এক ইঞ্চি বাঁদিক ঘেঁষে যাবে,' নিরাসক্ত গলায় বলল শায়লা। 'ভাল চাও তো ফেলে দাও অস্ত্র।'

'আমরা দশজন, শায়লা,' শান্ত গলায় বলল ও। 'সবাই সশস্ত্র। তোমার এক পিস্তলে ক'টা গুলি? একটা খরচ হয়ে গেছে, আর ক'টা...'

বাঁ হাত সীটের আড়াল থেকে বের করে আনল প্রিন্সেস, সে হাতে আরেকটা অটোম্যাটিক দেখা গেল। 'এটাও ফুল লোডেড। এরপরও ঝুঁকি নিতে চাইলে নিতে পারো, আমি তৈরি আছি।'

দ্বিধায় পড়ে গেল ও। মেয়েটা এখনও যথেষ্ট দূরে, তাছাড়া ওর হাতের যে অব্যর্থ টিপ্, তাতে কোনরকম কায়দা করতে যাওয়া বোকামি হবে। আবার নির্দেশ না মানলেও বিপদ। চেহারা দেখে বোঝা যায় যেমন মরিয়া, তেমনি আতঙ্কিত হয়ে আছে মেয়েটা, এ অবস্থায় ওকে বেশি ঘাঁটাতে যাওয়াও একেবারেই উচিত হবে না।

'ঠিক আছে,' শ্রাগ করল ও। 'তুমিই জিতলে।' ঝুঁকল ওয়ালথার ফ্লোরে ছেড়ে দেয়ার জন্যে। এই সময় প্রিন্সেসকে তীক্ষ্ণ গলায় 'খবরদার!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল রানা, পরমুহূর্তে গুলির শব্দে ফের কেঁপে উঠল প্লেন। পিছনে দড়াম করে কাউকে আছড়ে পড়তে শোনা গেল।

কি ঘটেছে দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না রানা, গুলি করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়েছিল শায়লা, সুযোগটা ষোলো আনা কাজে লাগাল। ঝুঁকে থাকা অবস্থায়ই কব্জি ঘুরিয়ে ওপরমুখো গুলি করল ও। বুক সই করে ছুঁড়েছিল, কিন্তু সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়ায় শায়লার গলায় বিঁধল বুলেট। ছোটখাট দেহটা ছিট্‌কে গিয়ে সীটের ব্যাকে আছড়ে পড়ল, উড়ে গেল দুই অটোম্যাটিক। দুই হাতে গলা খামচে ধরে হাঁসফাঁস করতে লাগল প্রিন্সেস, বিস্ফারিত চোখ জোড়া ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড়। দম আটকে যাওয়ায় বিকট ঘড়ঘড় শব্দ বের হচ্ছে গলা দিয়ে। রক্তে দুই ফরসা হাত, গলা-বুক ভেসে যাচ্ছে।

পিছনে তাকিয়ে মুসাকে গড়াগড়ি খেতে দেখল রানা। হামিদ ও সিলভি ঝুঁকে আছে তার ওপর। রক্তে ভাসছে ফ্লোর।

'কি করেছিল ও?' প্রশ্ন করল রানা।

সিলভি মুখ তুলল। 'আমার পিস্তল নিয়ে ওকে গুলি করতে গিয়েছিল।'

'আঘাত কিরকম?'

'বাঁচবে। উরুতে লেগেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়েনি দেখে আশ্বস্ত। প্রিন্সেসের দিকে তাকাল। স্থির হয়ে গেছে সে। বিস্ফারিত নেত্রে ওকেই দেখছে। কনুই পর্যন্ত রক্তে ভেজা দু'হাত কোলের ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে।

'কে যেন আসছে!' চাপা গলায় সতর্ক করল মাহমুদ।

শায়লার পরিণতির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল রানা, মাঝপথে আটকে গেল সেটা।

বারো

'আড়াল নাও তোমরা!' চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল রানা। 'হারি আপ!'

বলতে না বলতে সবক'টা মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেনের সামনের দিকে, সীটের ফাঁকে ঢুকে বাল্কহেডে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়েছে। রানাও তাই করল, তবে গেটের অনেক কাছে। কেউ ভেতরে ঢুকে দু'পা এগোলেই তাকে দেখতে পাবে ও।

বাইরে কথা বলে উঠল কেউ। বাতাসতাড়িত, এলোমেলো

কথা, কিছুই বোঝা গেল না। তবে গলাটা যে শের খানের, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না রানার। খানিক পর কথা শেষ হলো, ল্যাডারে পায়ের আওয়াজ উঠল। দম বন্ধ করে বসে থাকল রানা।

এক মুহূর্ত পর খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল শের খান। সারা গায়ে বালি চিক্‌চিক্‌ করছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে 'গার্ড ব্যাটা কোথায় গেল!' বলে ভেতরে এসে আইলের এ-মাথা ও-মাথা চোখ বোলাল সে। 'আশ্চর্য! হারামজাদারা সব মরেছে নাকি?'

আরও এক পা এগোল লোকটা, চোখ কুঁচকে বাইরের দিকে তাকাল। বিড় বিড় করে বলল, 'দরজা খোলা, অথচ গার্ড…ব্যাপার কি!'

ফ্লোর ঢেকে রাখা বালিতে গাল রেখে সামনের সীটের তলা দিয়ে লোকটার ওপর নজর রেখেছে রানা, হাতে ওয়ালথার তৈরি। মনে মনে চাইছে আরেকটু এগিয়ে আসুক ব্যাটা, যাতে বিপদ দেখলেও সরে পড়তে না পারে।

কি খেয়াল হতে দ্রুত প্লেনের পিছনদিকে তাকাল শের খান, গলা চড়িয়ে ডাকল, 'প্রিন্সেস! প্রিন্সেস!'

জবাব নেই।

'প্রিন্সেস! কোথায় তুমি?' বলতে বলতে এগোতে শুরু করল সে। তাকে আসতে দেখে চট্‌ করে বাল্কহেডের দিকে সরে গেল রানা, সামনের সীটের ব্যাকে মিশে নেই হয়ে যেতে চাইল। কিন্তু তার দরকার ছিল না, বাঘের ঘরে ঘোগ এসে বসে থাকতে পারে, তেমন আশঙ্কা লোকটার মাথাতেই আসেনি। রানার সামনে দিয়ে হন্‌ হন্‌ করে হেঁটে চলে গেল।

কয়েক পা যেতেই সীটের ওপর দিয়ে প্রিন্সেসের মাথা চোখে পড়ল তার। 'আরে! তুমি এখানে বসে আছ, আর আমি ওদিকে

ডেকে ডেকে...' আতঙ্কিত এক বিস্ময় ধ্বনির সাথে স্তব্ধ হয়ে গেল শের খান, ব্রেক কষল জায়গায়। হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত লাশটা দেখল, তারপর কি খেয়াল হতে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল।

পাঁচ হাত দূরে পিস্তল হাতে রানাকে দেখতে পেয়ে অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো লোকটার। তার ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত চেহারা দেখে মুচকে হাসল ও। 'হ্যালো, শের খান!' অমায়িক হেসে হাসির সাথে মাথা দোলাল। 'তোমাকে এভাবে চমকে দেয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু কিছু করার ছিল না।'

ধীরে ধীরে চোয়াল ঝুলে পড়ল লোকটার, চশমার পিছন থেকে হাবার মত চেয়ে আছে, চোখের মণি নড়ছে ঘন ঘন।

'তোমার খেলা শেষ, খান,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল রানা। 'এতদিন অন্যের মৃত্যু তুমি যে ভাবে চেয়েছ, সেভাবেই হয়েছে। আজ তোমার পালা। বলো কিভাবে মরতে চাও। সিলভি! এবার উঠে আসতে পারো তোমরা।'

আড়াল থেকে এক এক করে উঠে পড়ল সবাই, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। পালা করে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল শের খান।

'কি হলো, কথা বলছ না যে!' ওয়ালথার দোলাল রানা। 'বলো, বলো! শুধু তোমাকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, আরও কাজ আছে আমাদের।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু সুযোগ হলো না। পিছন থেকে গম্ভীর গলার 'হ্যান্ডস আপ!' শুনে জমে গেল। 'একজনও যদি নড়েছ ম্যাসাকার ঘটিয়ে দেব।'

গলাটা চিনতে পারল রানা। ফিলিপ বয়েলের। সে-ও যে দলে আছে, এই প্রথম জানল রানা। পিছনে তাকাল ও, দরজার কাছে দাঁড়ানো দেখতে পেল যবককে। হাতে স্টেনগান। চোখাচোখি হতে

ওর ওয়ালথার দেখিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ফেলে দাও ওটা।'

এক পলকে পরিস্থিতি বোঝা হয়ে গেল রানার। ফিলিপের খুব কাছেই রয়েছে সিলভি ও ক্লারিসা, অন্যরাও খুব একটা তফাতে নেই। অর্থাৎ এখন কিছু করতে যাওয়া হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। দরজাটা···ভাবল ও, দরজাটা বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল। সময়মত চিন্তাটা মাথায় আসেনি বলে নিজেকে অভিসম্পাত করল রানা। ফিলিপের চোখে চোখ রেখে মুঠো আলগা করে দিল, ঠক্ করে ফ্লোরে পড়ল ওটা।

ফোঁশ করে চেপে রাখা দম ছাড়ল শের খান। কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে কৃতজ্ঞ চোখে ফিলিপের দিকে তাকাল। 'ধন্যবাদ! ঠিক সময়মতই এসেছ তুমি। আরেকটু দেরি হলে···' রানার দিকে তাকাল। মুখে 'বেঁচে গেলাম' ধরনের হাসি। 'পিস্তলটা পা দিয়ে এদিকে ঠেলে দাও, রানা,' বলে হাসল। 'তুমি বেশি বুদ্ধিমান, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অতি চালাকের গলায় দড়ি বলে যে একটা কথা আছে, তা জানো না বুঝি?'

এগিয়ে এসে ওর ঠেলে দেয়া ওয়ালথার তুলে নিল লোকটা। 'এখন বুঝলাম গার্ডদের কেউ নেই কেন। বাইরের অবস্থা কি, ফিলিপ?'

'ঝড়ের গতি কমে আসছে। মনে হচ্ছে থেমে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।'

'গুড! আরেকটু কমলে বাইরে নিয়ে এদের ব্যবস্থা করতে হবে। কি যেন বলছিলে তখন, রানা? আমি কিভাবে মরতে চাই, কেমন? প্রশ্নটা এবার আমি করছি তোমাকে। বলো, কি ভাবে মৃত্যু চাও। অনেক ভুগিয়েছ তুমি, আর না।' আচমকা রুদ্রমূর্তি ধরল সে। 'অ্যাই! যার যার রাইফেল-পিস্তল মেঝেতে রাখো তোমরা। হারি আপ্! ফিলিপ, খেয়াল রাখো।'

হ্যারির সাথে চোখাচোখি হলো রানার। ফিলিপের অজান্তে চোখ টিপে দিল ও, কিন্তু হ্যারি তা দেখেছে বলে মনে হলো না। কাঁধ থেকে আলতো করে রাইফেল নামাল সে, ঝুঁকে ফ্লোরে রাখল। পরমুহূর্তে পিস্তলের গুলির শব্দে কেঁপে উঠল প্লেন, ছিটকে গিয়ে বাল্কহেডের গায়ে আছড়ে পড়ল ফিলিপ। তারপর সটান মেঝেতে।

সিলভি করেছে গুলিটা। রাইফেল রেখে দেয়ার ফাঁকে বুদ্ধি করে দেহের আড়ালে থাকা বাঁ হাতে কোমরে গোঁজা অটোম্যাটিকটা আলগোছে বের করে ফেলেছিল ও, ফিলিপি টের পায়নি। গুলিও বাঁ হাতেই করেছে সিলভি।

এসবের কিছুই দেখতে পায়নি রানা, দেখার জন্যে অপেক্ষাও করল না, শের খানের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই ঝাঁপ দিল। থতমত খেয়ে ওয়ালথার তুলতে যাচ্ছিল লোকটা, এমন সময় তার ওপর লাফিয়ে পড়ল ও। হুড়মুড় করে ফ্লোরে আছড়ে পড়ল দু'জনে। ওরই ফাঁকে রানার মাথা সই করে ওয়ালথার চালিয়েছিল শের খান, কিন্তু ও সময়মত মাথা সরিয়ে নেয়ায় আঘাতটা লাগল না। পরমুহূর্তে এক ঘুসিতে লোকটার অভিজাত চেহারার বারোটা বাজিয়ে দিল ও, মসৃণ, ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাকটা সমান করে দিল, জোর ঝাঁকিতে হাতলবিহীন চশমাটা আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

আরেক ঘুসিতে তার চোয়ালের হাড় স্থানচ্যুত করে দিল রানা, ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল শের খান। মুঠো থেকে ওয়ালথার উড়ে গেল। মরিয়া হয়ে উঠল সে, অন্ধের মত সমানে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। কাঁধে, পাঁজরে, বেমক্কা কয়েকটা ঘুসি খেয়ে চোখে আঁধার দেখল রানা, লোকটার হাতের নাগালের বাইরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু পারল না। পায়ের পিছনে এক পা বাধিয়ে অন্য পায়ে কষে লাথি ঝাড়ল খান, পড়ে গেল রানা। এই ফাঁকে তড়াক করে উঠে পড়ল লোকটা, তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তীরবেগে ছুটল দরজার দিকে। হ্যারি আর মাহমুদ তাকে বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু ব্যাপার বুঝে উঠতে মুহূর্তখানেক দেরি হয়ে যাওয়ায় তার নাগাল পেল না ওরা, এক লাফে বেরিয়ে গেল শের খান।

সামলে নিয়ে রানাও ওয়ালথার হাতে পিছন পিছন ছুটল। ওটার ওপরই আছাড় খেয়ে পড়েছিল। একলাফে বাইরে পড়েই গড়ান দিয়ে ল্যাডারের আড়ালে চলে এল ও, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল লোকটার খোঁজে।

ঝড়ের তেজ কমেছে ঠিকই, তবে বেশি নয়। আঁধার হয়ে আছে চারদিক, কিছু দেখার উপায় নেই। আকাশ এখনও ভীতিকর রকম লালচে হয়ে আছে, বাতাসের গোঁ গোঁ গর্জনে বুক কেঁপে ওঠে।

কিছুক্ষণ পর প্লেনের নোজ হুইলের দিকে অস্পষ্ট নড়াচড়া চোখে পড়তে চট্ করে শুয়ে পড়ল ও, চোখ কুঁচকে ঠিক দেখেছে কি না, বোঝার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ভুল দেখেনি, সত্যিই কিছু নড়ছে ওখানটায়। ভাবতে না ভাবতেই গান মায্‌লের ঝলক দেখতে পেল রানা, ওর মাথার ওপরে কোথাও 'ঠং' আওয়াজ উঠল। গুলির আওয়াজ শুনতেই পায়নি।

দ্রুত ল্যাডারের অন্য পাশে চলে এল রানা, আরও গুলির অপেক্ষায় ওয়ালথার বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকল। কয়েক সেকেন্ড পর আবার গুলি হলো, সঙ্গে সঙ্গে মায্‌ল ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে দিল রানা, পরপর তিনবার। ও তরফের তৃতীয় ফ্ল্যাশ ঝাঁকি খেতে দেখে বোঝা গেল কাজ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে সরে যেতে শুরু করল অস্পষ্ট ছায়াটা। পিছন দিকে সরে যাচ্ছে শের খান। এমন সময় হঠাৎ করে বাতাসের বেগ কমে আসতে শুরু করল, সেই সাথে গর্জনও। দেখতে দেখতে থেমে গেল গিলবি, যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, ঠিক তেমনি করে। খানিক পর সূর্যের আলোয় হেসে উঠল চারদিক।

চোখ পিট্ পিট্ করে ওর দিকে তাকাল শের খান, বোকা বোকা চেহারা। এমনভাবে ওকে দেখছে, যেন চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। ডান হাতে পিস্তল, রক্ত ঝরছে আঙুল বেয়ে। গুলি লেগেছে, কিন্তু কোথায়, বোঝা গেল না। বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে পিস্তল তুলতে শুরু করল সে।

'থামো, শের খান!' লোকটাকে সতর্ক করল ও। 'নইলে গুলি করব আমি। যদি বাঁচতে চাও, ফেলে দাও পিস্তল।'

শুনল না সে, হাত উঠছেই। তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মত বদল করার সুযোগ দিল রানা, তারপর গুলি করল হৃৎপিণ্ড সই করে। একই মুহূর্তে খানও গুলি করল, তবে স্বেচ্ছায় নয়, আঙুলের টানে আপনাআপনি বেরিয়ে গেল সেটা। রানার মাথার অনেক ওপর দিয়ে চলে গেল। পরমুহূর্তে হাত-পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল লোকটা। স্থির হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল।

আকাশ একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে এর মধ্যে। গিলবির চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। প্রকৃতির চেহারা দেখে বোঝার উপায়ই নেই এতক্ষণ কী ভয়াবহ তাণ্ডব চলেছে এখানে।

ক্যাম্পের দিকে তাকাল ও। ওটারও কোন চিহ্ন নেই। আগুনে পুড়ে আগেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, বাকিটকু গেছে গিলবির বিষাক্ত থাবা

মুখে পড়ে। তাও ভাল প্লেনটা অক্ষত আছে, ভাবল রানা। কথাবার্তার আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল, দেখল ওরা সবাই নেমে আসছে ওটার ভেতর থেকে। হ্যারি বেলভিল রয়েছে সবার আগে।

শের খানের মৃতদেহের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রাগ করল সে। 'তোমার কোথাও লাগেনি তো, রানা?'

মাথা নাড়ল ও।

'বাঁচলাম!'

সিলভি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ওর দিকে। মুখে স্বস্তির ও নির্ভরতার হাসি।

***

মাসুদ রানা

বিষাক্ত থাবা

[একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস]

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ভেবেছে ঘটনার শুরু বুঝি লন্ডনেই,
কিন্তু না, শুরু অনেক আগেই হয়েছে।
প্রখ্যাত ইজিপ্টোলজিস্ট স্যার কার্টারের নির্মম হত্যাকাণ্ড
আসলে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ছিল।
ক্যামবিসিসের সেনাপতির কবর-ফলক হাতছাড়া
হওয়ায় বিপাকে পড়ল ও। শের খান, হাবিব বে ও
লাস্যময়ী মিশরীয় প্রিন্সেস, শায়লার পাতা ফাঁদে পা
দিয়ে বসল। বেধে গেল ভয়াবহ সংঘাত।
লিবিয়ান ডেজার্টে ঝড় উঠল, প্রাণের শত্রু শের খানও
অবশেষে জায়গামত হাজির, আর রক্ষা নেই।
একদল মানুষের জীবন নির্ভর করছে ওর ওপর,
অথচ করার কিছু নেই। বাঁচার কোন পথই নেই।
এখন? কি করবে মাসুদ রানা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০